জাতীয়তার নবমন্ত্র

বা

হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

নিবেদন

'জাতীয়তার নবমন্ত্র' প্রকাশিত হইল। গত শতাব্দীর ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকে জাতীয় বা হিন্দু মেলা ভারতবাসীর প্রাণে যে জাগরণ আনিয়াছিল তাহা সত্যসত্যই অভূতপূর্ব্ব। এই কাহিনীই এই পুস্তকে বর্ণিত হইল। কৃষি শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান ললিতকলা শারীর বিদ্যা—জাতীয় উত্থান বলিতে সাধারণতঃ যে-সব বিষয়ের উন্নতি ও প্রসারের কথা আমরা বুঝি এই মেলার বিভিন্ন বিভাগের কার্য্য দ্বারা তাহা সম্পাদিত হইতে আরম্ভ হয়। যে সকল বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহার প্রত্যেকটিতেই যে তাঁহারা চরম সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহাদের অবলম্বিত পন্থা অনুসরণ করিয়া পরবর্ত্তীকালে স্বদেশবাসীরা এ সকল বিষয়ে অনেকটা সফলকাম হইতে সক্ষম হইয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা আবশ্যক। হিন্দু মেলা প্রথমে হিন্দুদের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে একতা সম্পাদন করিতে অগ্রসর হন যাহাতে সকলেই কায়মনে জাতীয় উন্নতি বিষয়ে সহায়তা করিতে পারে। এই ধারণা ক্রমে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনুক্রামিত হইতে থাকে এবং সপ্তম দশকের মধ্য ভাগেই হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সকল সম্প্রদায়েরই উন্নতিকল্পে এক-যোগে চেষ্টা চলিতে আরম্ভ হয়। হিন্দুদের সম্মেলন-স্পৃহা যখন কার্য্যে পরিণত হইল তখন ইহা শুধু তাহাদের মধ্যেই নিবদ্ধ রহিল না, এক ভারতীয় মহাজাতি গঠনের জন্য অন্যান্য সম্প্রদায়কেও ইহার মধ্যে টানিয়া আনা হইল। ইণ্ডিয়ান লীগ, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান নেশন্যাল কংগ্রেস একই উদ্দেশ্যে ভারতীয় মহাজাতির ঐক্য সংসাধনের এক একটি ধাপ।

ভারতবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে স্বাবলম্বন বা আত্মশক্তির উপর নির্ভর সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্য হইতেই সুরু করিয়াছি। প্রকৃত প্রস্তাবে এই সময় হইতেই এই ধারণাটি আমাদের

মধ্যে ধীরে ধীরে শিকড় গড়িতে থাকে যে, আমরা শাসকজাতি নিরপেক্ষ হইয়াও স্বীয় উন্নতি সাধন করিতে পারি। প্রায় পঁচিশ বৎসরের শিক্ষা, প্রচার ও রাজকীয় কারণসমূহের ফলে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এই ধারণা হিন্দু মেলার মধ্যে একটি পরিপূর্ণ আকারে আত্মপ্রকাশ করে। কেহ কেহ রাজা রামমোহন রায়কে আমাদের যাবতীয় প্রগতিশীল ভাবধারার প্রবর্ত্তক বা সূচনাকারী বলিয়া জ্ঞান করেন। তাঁহার সময়ে ইংলণ্ডের একটি ব্যবসায়ী কোম্পানী মাত্র আমাদের শাসক ছিল। তখন তাঁহার এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, ভদ্র ইংরেজ ও শিক্ষিত ভারতবাসী মিলিত হইলেই ভারতবর্ষের দ্রুত উন্নতি হওয়া সম্ভব। ঐ সময়ের পক্ষে ইহা হয়ত ঠিক ছিল, কিন্তু কালে ইহার বিপরীতই প্রতিপন্ন হইয়াছে। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সনন্দের পর হইতেই ক্রমে ইংরেজ জাতি আমাদের শাসক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এদেশের উন্নতিপক্ষে ইংরেজ ও ভারতবাসীর স্বার্থ এবং দৃষ্টিভঙ্গি দুই-ই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। শাসক-শাসিতের মধ্যে স্বার্থ-সংঘাতও হিন্দু মেলার মত জাতীয় আন্দোলনের সূচনার কারণ।

জাতীয় মেলার কথা ইতিপূর্ব্বে 'মাতৃভূমি' মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা অনেকাংশে সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া বর্ত্তমান পুস্তকে গ্রথিত হইল। জাতীয় মেলার নেতৃস্থানীয় দশ জনের চিত্র এখানে দেওয়া হইল। নবগোপাল মিত্রের চিত্রখানি তাঁহারই দৌহিত্র শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বসু আমাকে ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। একখানি বাদে অন্য সমুদয় ব্লক 'মাতৃভূমি' হইতে গৃহীত। প্রচ্ছদপট উদীয়মান শিল্পী শ্রীমান্ তিলক বন্দ্যোপাধ্যায় আঁকিয়া দিয়াছেন। পুস্তকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কেহ কোন নূতন তথ্য আমাকে দিতে পারিলে তাহা সকৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করিব।

কলিকাতা
১লা আশ্বিন, ১৩৫২ সাল } **শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল**

দেশসেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ যাঁহারা

তাঁহাদের উদ্দেশে

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

নবগোপাল মিত্র

প্রথম অধ্যায়

পূর্ব্বাভাষ

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতেই ভারতবর্ষের উন্নতি-প্রচেষ্টায় দুইটি ধারা চলিয়া আসিতেছিল। একটি শাসক জাতির সহযোগে ও তাহার অনুকরণে স্বদেশের উন্নতি সাধন, অপরটি—অন্যের সাহায্যের অপেক্ষা না করিয়া বা অপরের অনুকরণ না করিয়া স্বচেষ্টায় স্বদেশের কল্যাণ করা। এই দ্বিতীয় ধারার উদ্গাতাদের মধ্যে তত্ত্ববোধিনী সভা ও তাহার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' অন্যতম বলা চলে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি তত্ত্ববোধিনী সভার নেতৃবর্গ স্বীয় চিন্তা পত্রিকার মধ্য দিয়া প্রচার করিয়া, নিজেদের এবং অপরাপর ব্যক্তিদের কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিতেন। স্বাতন্ত্র্যবোধ ও স্বাবলম্বন—এই দুইটির উপরই যে আমাদের জাতীয় উন্নতি বিশেষ ভাবে নির্ভর করে, এই বাণী তাঁহাদের প্রমুখাৎ আমরা সুস্পষ্ট শুনিতে পাই। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর,' কাশীপ্রসাদ ঘোষের 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার,' গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'হিন্দু পেট্রিয়ট,' দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশ,' গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বেঙ্গলী' প্রভৃতি পত্রিকাও বাঙালীর মনে এই বৃত্তিদ্বয়ের উন্মেষে সহায়তা করে। গুপ্তকবির স্বদেশপ্রীতিমূলক কবিতাবলী, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান,' হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্রসংহার' প্রভৃতিও এই নূতন ভাবের খোরাক কম জোগায় নাই।

কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার প্রাবল্যে এবং স্বদেশীয় শিক্ষার অনাদর হেতু তাঁহাদের কথা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর সাধারণ ভাবে কার্য্যকরী

হওয়া সম্ভবপর ছিল না। যুগ-যুগান্তের মোহনিদ্রা হইতে জাগাইলেও ইংরেজী শিক্ষা আমাদিগকে নূতন করিয়া মোহাবিষ্ট করিয়া তুলিতেছিল। মনস্বী রাজনারায়ণ বসু স্বয়ং ইংরেজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত এবং বঙ্গ-সন্তানদের ইংরেজী শিক্ষা-দানে রত—তিনি নব্যবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত এক প্রধান ব্যক্তি। তাঁহার নিকট ইংরেজী শিক্ষার কুফলগুলি যেমন প্রতিভাত হইয়াছিল এমনটি বোধ হয় আর কাহারও নিকট হয় নাই। তিনি মেদিনীপুর সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকা কালে তিনি তথায় বহু জনহিতকর সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে সুরাপান-নিবারণী সভা প্রতিষ্ঠা করিয়া মদ্যপায়ীদের বিষম কোপে পড়িয়াছিলেন। কিন্তু বিদেশী শিক্ষার একটি কুফল নিরাকরণের চেষ্টা করিলেই তো মূল সংশোধন হয় না, তাই তিনি এই সময় জাতীয় গৌরব সম্পাদনী বা গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা স্থাপন করিলেন। স্বদেশীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি, ভাষা-সাহিত্য, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, এক কথায় আমাদিগের যাহা কিছু নিজস্ব তৎসমুদয় রক্ষণ ও পোষণ করাই ছিল এই সভার উদ্দেশ্য। এই সভার কার্য্যক্রম লইয়া একটি ব্যাপকতর প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যে রাজনারায়ণ ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজীতে একখানি অনুষ্ঠান-পত্র রচনা করেন। এই অনুষ্ঠান-পত্রখানির মধ্যে

"হিন্দু ব্যায়াম, হিন্দু সঙ্গীত, হিন্দু চিকিৎসা বিদ্যা এবং সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলন, যত পারা যায় বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার করিয়া আমাদিগের কথোপকথনের ভাষার বিশুদ্ধতা সম্পাদন, বাঙ্গালা ভাষায় পরস্পর পত্রলেখা এবং বাঙ্গালীর সভাতে বাঙ্গালায় বক্তৃতা করা, সুরাপানাদি বিদেশীয় অনিষ্টকর প্রথা যাহাতে প্রচলিত না হয় তাহার উপায় অবলম্বন করা, হিন্দু শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া সমাজ সংস্কার কার্য্য

সম্পাদন করা, স্বদেশীয় সুপ্রথা সকল রক্ষা করা, নমস্কার প্রণামাদি স্বদেশীয় শিষ্টাচার পালন করা, বিদেশীয় রীতিতে পরিচ্ছদ পরিধান ও আহার কার্য্য সম্পাদন পরিত্যাগ করা, দেশীয় ভাষায় নাটকাদি অভিনয় করা ইত্যাদি বিবিধ বিষয় আলোচিত হয়।"*

জাতীয় মেলার জন্মকথা

বিদেশী শিক্ষার কুফল প্রতিরোধ করিয়া স্বদেশানুরাগের উন্মেষ ও বৃদ্ধিকল্পে রাজনারায়ণ মেদিনীপুরে যে সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার সূত্রপাত করেন তাহাই ব্যাপকতররূপ পরিগ্রহ করে জাতীয় মেলার মধ্যে। স্বদেশানু-রাগের প্রবাহ ফল্গু নদীর মত সাধারণের অলক্ষিতেই বহিয়া চলিয়াছিল। কলিকাতায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজ পরিবার ও সহকর্ম্মীদের মধ্যে ইহা অব্যাহত রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট 'নেশন্যাল পেপার' প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহার সম্পাদকীয় ভার অর্পণ করেন অনন্যকর্ম্মা যুবক নবগোপাল মিত্রের উপর। রাজনারায়ণের উক্ত অনুষ্ঠান-পত্রখানি 'নেশন্যাল পেপার'ই হুবহু মুদ্রিত করেন। এই অনুষ্ঠান-পত্রখানিতে বর্ণিত বিষয়বস্তু পাঠে সম্পাদক নবগোপাল মিত্রের মনে ইহার আদর্শে জাতীয় মেলা ও জাতীয় সভা প্রতিষ্ঠার কথা প্রথম উদিত হয়। রাজনারায়ণ বসু 'আত্ম-চরিতে' (পৃঃ ২০৮) লিখিয়াছেন:

"শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র মহোদয় আমার প্রণীত 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা'র অনুষ্ঠান-পত্র পাঠ করাতে হিন্দু মেলার ভাব তাঁহার মনে প্রথম উদিত হয়। ইহা তিনি আমার নিকট স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। এই হিন্দু মেলা সংস্থাপন করিবার পর উহার

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—আশ্বিন ১৭৯৮ শক

অধ্যক্ষতা করিবার জন্য মিত্র মহাশয় জাতীয় সভা সংস্থাপন করেন। উহা আমার প্রস্তাবিত 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা'র আদর্শে গঠিত হইয়াছিল।"

জাতীয় মেলা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগীদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান ছিলেন নবগোপাল মিত্র মহাশয়। কিন্তু তাঁহার এই কার্য্যে প্রথম হইতেই সহায় হইয়াছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন:

"নবগোপাল একটা ন্যাশনাল ধূয়া তুলিল; আমি আগাগোড়া তার মধ্যে ছিলাম। সে খুব কাজ করিতে পারিত; কুস্তি জিমনাষ্টিক প্রভৃতির প্রচলন করার চেষ্টা তাঁর খুব ছিল; কিন্তু কি রকম কি হওয়া উচিত, সে সব পরামর্শ আমার কাছ থেকে লইত।" *

মহর্ষির ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরও জাতীয় মেলার বিশিষ্ট কর্ম্মী ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন:

"আমি বোম্বাইয়ে কার্য্যারম্ভ করবার কিছু পরে কলিকাতায় এক স্বদেশী মেলা প্রবর্ত্তিত হয়। বড়দাদা নবগোপাল মিত্রের সাহায্যে মেলার সূত্রপাত করেন, পরে মেজদাদা [গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর] তাতে যোগদান করায় প্রকৃতপক্ষে তার শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয়।"†

ভারতবাসীদের মনে স্বাজাত্যবোধ ও স্বাবলম্বন-বৃত্তির উন্মেষে এই মেলার কৃতিত্ব অসামান্য। রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ প্রখ্যাত মনীষীগণ বিভিন্ন পুস্তকে, প্রবন্ধে, বক্তৃতায় এবং নিজ নিজ স্মৃতি-কথায় জাতীয়

*পুরাতন প্রসঙ্গ (দ্বিতীয় পর্য্যায়)—বিপিনবিহারী গুপ্ত। পৃঃ ২০৬।

† আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ৩৫।

মেলার বিষয় বলিয়া গিয়াছেন। জাতীয় ভাবের উদ্বোধন কল্পে ইহা সে-যুগে কতখানি কার্য্যকরী হইয়াছিল এইসব মনীষীর রচনা হইতে তাহা সম্যক্ বুঝা যায়। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন :

"কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা, দীনবন্ধুর নাটক, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সোমপ্রকাশ, মহেন্দ্রলাল সরকারের হোমিওপ্যাথি, এই সকলের মধ্যে শিক্ষিত দলের মনে যেমন নবভাব আনিয়া দিতেছিল, তেমনি আর এক কার্য্যের আয়োজন হইয়া নব আকাঙ্ক্ষার উদয় করিয়াছিল। তাহা…নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত, 'জাতীয় মেলা' নামক মেলা ও প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা এবং দেশের সকল বিভাগের ও সকল শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের তাহার সহিত যোগ। বঙ্গসমাজের ইতিবৃত্তে ইহা একটি প্রধান ঘটনা; কারণ সেই যে বাঙ্গালির মনে জাতীয় উন্নতির স্পৃহা জাগিয়াছে তাহা আর নিদ্রিত হয় নাই।"*

প্রথম অধিবেশন, ১৮৬৭

জাতীয় মেলার প্রথম অধিবেশন হয় সন ১২৭৩ সালের চৈত্র-সংক্রান্তিতে। প্রথম তিন বৎসর চৈত্র-সংক্রান্তিতে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়, এ কারণ তখন ইহা চৈত্র-মেলা নামে পরিচিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে 'হিন্দু মেলা' নামেই ইহা সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করে। প্রথম বৎসরে কলিকাতার উপকণ্ঠে আশুতোষ দেবের বেলগাছিয়া উদ্যানে ইহা স্বল্পাকারে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। জাতীয় মেলার অন্যতম উৎসাহী কর্ম্মী মনোমোহন বসু বলেন, "জন্মদিনে কেবল অনুষ্ঠাতা ও কতিপয় বান্ধব মাত্র উৎসাহী ছিলেন। সে যেন নিজ বাটী ও পাড়াটী বলিয়া শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করা।" † এই বৎসর রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ছুটিতে

* রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ। ২য় সং। পৃঃ ২৫৭।

† বক্তৃতামালা—মনোমোহন বসু। পৃঃ ১৫।

নিজ গ্রাম বোড়ালে বাস করিতেছিলেন। জাতীয় মেলায় পাঠের নিমিত্ত বোড়াল-বাসীদের রচিত একটি স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক কবিতা সংশোধনান্তর তিনি কর্তৃপক্ষকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এই কবিতাটি তাঁহার আত্ম-চরিতে স্থান পাইয়াছে।

প্রথম বার অনুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠাতৃগণ জাতীয় মেলার উদ্দেশ্য ও সাধনোপায় সাধারণের নিকট প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় বারের মেলার কার্য্যবিবরণীতে এ সব স্থান পাইয়াছে। জাতীয় মেলার সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সহকারী সম্পাদক নবগোপাল মিত্র একযোগে লিখিলেন :

"১৭৮৮ শকের চৈত্র সংক্রান্তিতে যে একটি জাতীয় মেলা হইয়াছিল, স্বজাতীয়দিগের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করা ও স্বদেশীয় ব্যক্তিগণ দ্বারা স্বদেশের উন্নতিসাধন করাই তাহার উদ্দেশ্য।"

উদ্দেশ্য সাধনোপায় ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। এ সম্বন্ধে তাঁহারা লেখেন :

"১। এই মেলাভুক্ত একটি সাধারণ মণ্ডলী সংস্থাপিত হইবে, তাঁহারা হিন্দুজাতিকে উপরোক্ত লক্ষ্যসকল সংসাধন জন্য একদলে অভিভুক্ত এবং স্বদেশীয় লোকগণ মধ্যে পরস্পরের বিদ্বেষভাব উন্মূলন করিয়া উপরোক্ত সাধারণ কার্য্যে নিয়োগ করতঃ এই জাতীয় মেলার গৌরব বৃদ্ধি করিবেন।

২। প্রত্যেক বৎসরে আমাদিগের হিন্দু সমাজের কত দূর উন্নতি হইল, এই বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ জন্য চৈত্র-সংক্রান্তিতে সাধারণের সমক্ষে একটি সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত পাঠ করা হইবে।

৩। অস্মদ্দেশীয় যে সকল ব্যক্তি স্বজাতীয় বিদ্যানুশীলনের উন্নতি সাধনে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করা যাইবে।

৪। প্রতি মেলায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের পরিশ্রম ও শিল্পজাত দ্রব্য সংগৃহীত হইয়া প্রদর্শিত হইবে।

৫। প্রতি মেলায় স্বদেশীয় সঙ্গীতনিপুণ ব্যক্তিগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করা যাইবে।

৬। যাঁহারা মল্লবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, প্রতি মেলায় তাঁহাদিগকে একত্রিত করিয়া উপযুক্ত পারিতোষিক বা সম্মান প্রদান করা যাইবে এবং স্বদেশীয় লোক মধ্যে ব্যায়াম শিক্ষা প্রচলিত করিতে হইবে।"

এই ছয়টি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেশের গণ্যমাণ্য ব্যক্তিগণ ছয়টি মণ্ডলীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা যথাক্রমে :

১। রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, রমানাথ ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীশ্বর মিত্র, দুর্গাচরণ লাহা, নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচরণ সরকার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, জয়গোপাল সেন, দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, কৃষ্ণদাস পাল এবং যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

২। নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ভোলানাথ পাল, রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং জগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচরণ সরকার, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, তারানাথ তর্কবাচস্পতি এবং হরিচরণ তর্কসিদ্ধান্ত।

৪। সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, জয়গোপাল সেন, প্রসাদদাস মল্লিক, প্রিয়নাথ ঘোষ, ব্রজনাথ দেব, জয়গোপাল মিত্র, যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং সালিকরাম।

৫। কুমার সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, অক্ষয়কুমার মজুমদার এবং ব্রজনাথ দেব।

৬। ঈশানচন্দ্র ঘোষাল, দুর্গাদাস কর, গোপাল মিত্র, অম্বিকাচরণ গুহ।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ, ভবানীচরণ গুহ, নীলকমল মুখোপাধ্যায় এবং যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় আয়ব্যয় পরীক্ষার ভার গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় অধিবেশন, ১৮৬৮

জাতীয় মেলার কার্য্য প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হয় ইহার দ্বিতীয় অধিবেশন হইতে। আশুতোষ দেবের বেলগাছিয়া উদ্যানে পরবর্ত্তী চৈত্র-সংক্রান্তিতে মেলার দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইল। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন মেলার উদ্বোধন করিলেন। এই উপলক্ষে রচিত * ভারতের প্রথম সিবিলিয়ন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মিলে সবে ভারত সন্তান, একতান মনপ্রাণ, গাও ভারতের যশোগান' সঙ্গীতটি গীত হইল। মেলার উদ্দেশ্য সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর সকলকে নিম্নরূপ বুঝাইয়া দিলেন:

"এই মেলার প্রথম উদ্দেশ্য, বৎসরের শেষে হিন্দু জাতিকে একত্রিত করা। এইরূপ একত্র হওয়ার যদ্যপি ফল আপাততঃ কিছু দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, কিন্তু আমাদের পরস্পরের মিলন ও একত্র হওয়া যে কত আবশ্যক ও তাহা যে আমাদের পক্ষে কত উপকারী তাহা বোধ হয় কাহারও অগোচর নাই। একদিন কোনো এক সাধারণ স্থানে একত্রে দেখাশুনা হওয়াতে অনেক মহৎকর্ম্ম সাধন, উৎসাহ বৃদ্ধি ও স্বদেশের অনুরাগ প্রস্ফুটিত হইতে পারে। যত লোকের জনতা হয় ততই ইহা হিন্দু মেলা ও ইহা হিন্দুদিগের জনতা এই মনে হইয়া হৃদয়

* সত্যেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন: "এই মেলা উপলক্ষে মেজদাদা কতকগুলি জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেন আর সেই মেলাই আমার ভারত-সঙ্গীতের জন্মদাতা"—আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস, পৃ. ৩৬।

আনন্দিত ও স্বদেশানুরাগ বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে। আমাদের এই মিলন সাধারণ ধৰ্ম্মকৰ্ম্মের জন্য নহে, কোন বিষয় সুখের জন্য নহে, কোন আমোদ-প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য—ইহা ভারত-ভূমির জন্য।

"ইহার আরও একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য আত্মনির্ভর। এই আত্মনির্ভর ইংরাজ জাতির একটি প্রধান গুণ; আমরা এই গুণের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আপনার চেষ্টায় মহৎ কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া এবং তাহা সফল করাকেই আত্মনির্ভর কহে। ভারতবর্ষের এই একটি প্রধান অভাব, আমাদের সকল কৰ্ম্মেই আমরা রাজপুরুষগণের সাহায্য যাচ্ঞা করি, ইহা কি সাধারণ লজ্জার বিষয়? কেন আমরা কি মনুষ্য নহি? মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া চিরকাল পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি আছে? অতএব যাহাতে এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়—ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।"

সম্পাদকের উদ্দেশ্য বিবৃতির পরে সহকারী সম্পাদক নবগোপাল মিত্র মহাশয় গত সম্বৎসরের রাজ্য, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, বিদ্যা, সমাজ প্রভৃতি বিভাগে ভারতবাসীদের কতদূর উন্নতি ও অবনতি হইয়াছে তাহা বিবৃত করেন। স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক বাংলা ও সংস্কৃত কবিতা এবং প্রবন্ধ মেলাস্থলে পঠিত হইয়াছিল। এ বৎসর যাঁহারা কবিতা পাঠ করেন তাঁহাদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ ভট্টাচার্য্য (পরে, শাস্ত্রী), অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী পরবর্ত্তীকালে কবি ও সাহিত্যিক রূপে যশস্বী হন। জাতীয় মেলার দুইটি বিশিষ্ট অঙ্গ স্বদেশীয় চারু ও কারু শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী এবং স্বদেশীয় ব্যায়াম ও কুস্তি প্রদর্শন। স্বদেশীয়দের দ্বারা স্বদেশজাত দ্রব্যাদির প্রদর্শনী এই মেলায়ই সৰ্ব্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হয়। এজন্য ইহার গুরুত্ব সমধিক। দ্বিতীয় অধিবেশন কালে—

"মেলা স্থলে একটি দীর্ঘ হোগলার চালা প্রস্তুত হইয়াছিল। এই চালার মধ্যে এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকগণের সূচীনির্ম্মিত শিল্পজ পদার্থসকল প্রদর্শিত হয়। ঐ স্থলে নানা প্রকার আসন, জুতা, থলিয়া, সরপোস প্রভৃতি রমণীয় পদার্থসকল সজ্জিত ছিল। ঐ সমুদায়ের মধ্যে স্ত্রীলোকের কৃত কতকগুলি কাজ অতি চমৎকার ছিল। এই চালার পূর্ব্বদিগের চালায় কতকগুলি অলঙ্কার ও হস্তিদন্তের পুত্তলিকা প্রদর্শিত হয়। উক্ত চালার সম্মুখেই আর এক চালা ছিল। ইহার মধ্যে আলিপুরের জেলের কয়েদিদিগের কৃত কতকগুলি উৎকৃষ্ট তোয়ালে, ঝাড়ন প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়। এগুলি দেখিতে যেমন সুন্দর তেমনি শক্ত। এই মেলার পূর্ব্বদিগে আর এক চালায় কতকগুলি ফল ও শাক প্রদর্শিত হয়।"

চিত্র বিভাগে পটুয়াদের অঙ্কিত পট ও অন্যান্য শিল্পীদের চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল :

"বৈঠকখানা বাটিটী পূর্ব্বোক্ত চালা সকলের মধ্যস্থলে অবস্থিত। গৃহ-প্রবেশের দ্বারে এতদ্দেশীয় শিল্পিগণকর্ত্তৃক পারিস-কর্দ্দমে নির্ম্মিত অভিষেক বেশধারিণী ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রতিমূর্ত্তি সন্নিহিত ছিল। এই প্রতিমূর্ত্তির পার্শ্বে নবদ্বীপের কুমারদিগের দ্বারা নির্ম্মিত কতকগুলি উত্তম পুত্তলিকা প্রদর্শিত হয়। প্রত্যেকের অঙ্গসৌষ্ঠব এবং যেখানকার যে শিরা ও যে উচ্চতা জীব শরীরে বিদ্যমান থাকে তাহা ঐ পুত্তলিকাগুলিতে লক্ষিত হইয়াছিল। প্রাচীন কালের গ্রীক প্রতিমূর্ত্তি-গুলিকে আদর্শ করিয়া ঐ সমুদায় নির্ম্মিত হয়। আর এক গৃহে এদেশীয় শিল্পিগণের কৃত কতকগুলি চিত্র ছিল। জয়পুরের প্রতিকৃতি, আলেক-জাণ্ডারের সহিত দেরায়সের পরিবারগণের সাক্ষাৎকার ও আয়ান ঘোষকে দর্শন করিয়া কৃষ্ণের কালীমূর্ত্তি; এই পটগুলি এবং কলিকাতার শিল্পবিদ্যালয়ের কতকগুলি ছাত্র প্রকৃতিকে আদর্শ করিয়া যে কতক-গুলি চিত্র করিয়াছেন, এ স্থলে তাহাও সংগৃহীত হইয়াছিল। আর

এক গৃহে পুরাণ সংক্রান্ত কথকতা হইয়াছিল। ঐ বৈঠকখানার সম্মুখের গৃহে অধ্যাপকদিগের শাস্ত্রীয় আলাপাদি হয়। পূর্ব্বদিগের গৃহে কতকগুলি সব আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া রসায়ন বিদ্যা সংক্রান্ত বিষয় সকল প্রদর্শন করেন।”

“বৈঠকখানার দক্ষিণ পূর্ব্ব, দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিমে তিনটী বাটী আছে। এই তিনটী বাটীতে ঝামাপুকুর জোড়া-সাঁকো ও শ্যামপুকুরে শকের সমবেত বাদ্য বাদিত হইয়াছিল।”

ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে :

“মেলায় এদেশীয় মল্লদিগের কৌশল প্রদর্শিত হয়। এই মল্লেরা যে সকল কৌশল প্রদর্শন করে, তাহা ভারতবর্ষীয়দিগেরই সৃষ্টি; এই নিমিত্ত আমরা অন্য কাহারও নিকটে ঋণী নহি। প্রথমতঃ লাঠি খেলা, পরে লাঠিতে ভর করিয়া লম্ফ দিয়া পতিত হওয়া; তৎপরে কুস্তি করা হয়। দর্শকগণ বিশেষতঃ ইউরোপীয়গণ ঢেঁকি ঘুরান দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছিলেন। এক স্কন্ধ হইতে অন্য স্কন্ধে ঢেঁকি লইয়া তাহা ক্রমাগত ঘূর্ণিত করা হয়। কিন্তু পশ্চাল্লিখিত কয়েকটি কৌশল দর্শনে সকলে অধিকতর তৃপ্তিলাভ করেন। একজন মল্ল এক ঢেঁকিতে বস্ত্র বাঁধিয়া তাহা দন্ত দ্বারা ধারণ পূর্ব্বক মস্তক ঘুরাইয়া পশ্চাতে নিক্ষেপ করে। আর এক জন শয়ন করিলে প্রথমতঃ তাহার বক্ষে এবং তৎপরে তাহার পৃষ্ঠের উপর চারিখানি ইট রাখা হয়। একজন মল্ল এক ঢেঁকির মোনা লইয়া এক আঘাতে ইটগুলি চূর্ণ করে। আর এক জন শবের ন্যায় স্পন্দহীন হইয়া শয়ন করিলে তাহাকে মৃত্তিকার মধ্যে প্রায় দুই মিনিট পর্য্যন্ত সমাহিত রাখা হইয়াছিল।”

ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে কতকগুলি যুবক ব্যায়াম প্রদর্শন করিলেন। তন্মধ্যে একজন এই ব্যায়াম উদ্দেশে একটি কবিতা পাঠ করেন। তাহার কিয়দংশ এই :

বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিখিলে যে ব্যায়াম।
সুস্থ চিত্তে সুস্থ দেহে পাইবে আরাম ॥
কেন বাঙ্গালীগণ এমন দুর্ব্বল।
নীচেদের কায় শ্রম, তাই এমন ॥
অন্যসব জাতি শ্রমে, সদাই আদরে।
তাই তারা নানা মতে সুখ ভোগ করে ॥

পরে একজন যুবক অশ্বারোহণ পূর্ব্বক বেড়া লঙ্ঘন করিয়া বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়াছিলেন। তৎপরে নৌকায় বাচ খেলা হয়। পরিশেষে বেলা ৬ টার সময় মেলা ভঙ্গ হয়।

জাতীয় মেলার দ্বিতীয় অধিবেশন হইতে এক একজন প্রধান বক্তা ইহার উদ্দেশ্যের পরিপোষক বক্তৃতা করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকার মনোমোহন বসু ওজস্বিনী ভাষায় এই অধিবেশনে এক বক্তৃতা করেন। জাতীয়তার ইতিহাসে এই বক্তৃতাটি নানা কারণেই স্মরণীয়। বক্তৃতার প্রথম অনুচ্ছেদেই ভারতবাসীর চরম লক্ষ্য রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাও যে আমাদের আয়ত্তের মধ্যে তাহাও তিনি আভাসে ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন :

"স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলে বোধ হয়, আজ আমরা একটি অভিনব আনন্দ-বাজারে উপস্থিত হইয়াছি। সারল্য আর নির্ম্মৎসরতা আমাদের মূলধন, তদ্বিনিময়ে ঐক্যনামা মহাবীজ ক্রয় করিতে আসিয়াছি। সেই বীজ স্বদেশ ক্ষেত্রে রোপিত হইয়া সমুচিত যত্নবারি এবং উপযুক্ত উৎসাহ তাপ প্রাপ্ত হইলেই একটি মনোহর বৃক্ষ উৎপাদন করিবেক। এত মনোহর হইবে, যে, যখন জাতি-গৌরব রূপ তাহার নব পত্রাবলীর মধ্যে অতি শুভ্র সৌভাগ্য-পুষ্প বিকশিত হইবে, তখন তাহার শোভা ও সৌরভে ভারত ভূমি আমোদিত হইতে থাকিবে। তাহার ফলের নাম করিতে এক্ষণে সাহস হয় না, অপর দেশের

লোকেরা তাহাকে "স্বাধীনতা!" নাম দিয়া তাহার অমৃতাস্বাদ ভোগ করিয়া থাকে। আমরা সে ফল কখনো দেখি নাই, কেবল জনশ্রুতিতে তাহার অনুপম গুণগ্রামের কথা মাত্র শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু আমাদিগের অবিচলিত অধ্যবসায় থাকিলে সে ফল না পাই, অন্ততঃ স্বাবলম্বননামা মধুর ফলের আস্বাদনেও বঞ্চিত হইব না! ফলতঃ একতাই সেই মিলন সাধনের একমাত্র উপায় এবং অদ্যকার এই সমাবেশরূপ অনুষ্ঠান যে সেই ঐক্য স্থাপনের অদ্বিতীয় সাধন, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।"

ভারতবর্ষে মেলার অভাব নাই, তবে এরূপ মেলার আবশ্যকতা কি, বিশেষত্বই বা কি? এ সম্বন্ধে বক্তা বলেন:

"বস্তুতঃ চতুর্দ্দিকস্থ অসংখ্য প্রকার মেলার মধ্যে এমন একটি বিশেষ মেলার প্রয়োজন হইতেছে কিনা, যাহা নির্ব্বিবাদে ভারতবর্ষস্থ সমস্ত শ্রেণীস্থ লোকের প্রীতিস্থল হইতে পারে—যেখানে ধর্ম্ম সংক্রান্ত মতভেদ তিরোহিত হইয়া সকলেই সৌভ্রাত্র ও সৌহৃদ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবেন—যেখানে বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, গাণপত, বুদ্ধ, জৈন, নাস্তিক, আস্তিক সকলেই আপনাপন মেলা ভাবিয়া নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে উৎসবের সমভাগী হইতে পারেন—যেখানে অন্যান্য মেলার অনুষ্ঠিত অথবা নব নব প্রকারের ক্রীড়া-কৌতুক, আমোদ-আহ্লাদ, বিদ্যা, সাধ্য, শিল্প, সাহিত্য, কৃষি, ব্যায়াম ইত্যাদি অধিকতর সুশৃঙ্খলা ও সুনিয়মে প্রদর্শিত ও পুরস্কৃত হইতে পারে। যদি এমন মেলার অভাব থাকে—যদি এমন রুচিকর কোনো একটী মহামেলার আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইয়া থাকে, তবে এই চৈত্র-মেলা সেই অভাব দূরীকরণার্থ—সেই প্রয়োজন সাধনার্থেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।"

ইতিপূর্ব্বে নানা বিষয়ে শাসক-সম্প্রদায়ের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে,

"কিন্তু এই চৈত্র মেলা নিরবচ্ছিন্ন স্বজাতীয় অনুষ্ঠান, ইহাতে ইউরোপীয়দিগের নামগন্ধ মাত্র নাই, এবং যে সকল দ্রব্য সামগ্রী প্রদর্শিত হইবে, তাহাও স্বদেশীয় ক্ষেত্র, স্বদেশীয় উদ্যান, স্বদেশীয় ভূগর্ভ, স্বদেশীয় শিল্প, এবং স্বদেশীয় জনগণে হস্ত-সম্ভূত! স্বজাতির উন্নতিসাধন, ঐক্যস্থাপন এবং স্বাবলম্বন অভ্যাসের চেষ্টা করাই এই সমাবেশের এক মাত্র পবিত্র উদ্দেশ্য।"

জাতীয় মেলার প্রদর্শনী বিভাগ ভবিষ্যতে কতখানি ব্যাপক হইতে পারে তাহার উল্লেখ করিয়া মনোমোহন বলেন ঃ

"যে শিল্পী, যে কৃষক, যে উদ্যান-পালক, যে যন্ত্রী, যে গায়ক, যে পাইক, যে পলওয়ানকে আজ অনুরোধ করিয়া ডাকিয়া আনিতে হইল, এবং যে সকল দ্রব্য সামগ্রী লোকের বাটী বাটী গিয়া সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইল ; যখন দেখিবেন সেই সকল লোক ও সেই সমূহ দ্রব্যসম্ভার আপনা হইতেই আসিতেছে—যখন দেখিবেন ঢাকা ও শান্তিপুরের তন্তুবায়গণ, কাশী ও কাশ্মীরের কারুগণ, জয়পুর ও লক্ষ্ণৌয়ের ভাস্করগণ, চণ্ডালগড় ও কুমারটুলির কুমারগণ, পাটনার কৃষকগণ, অথবা সংক্ষেপে বলিতে গেলে উত্তর ও দক্ষিণের—পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সম-ব্যবসায়ী, সম-শিল্পী, এবং সমবিদ্য গুণীগণ এই চৈত্র-মেলার রঙ্গ-ভূমিতে আপনা হইতে আসিয়া পরস্পর প্রতিযোগিতা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে—যখন দেখিবেন তাহারা এই মেলার প্রদত্ত প্রতিষ্ঠা ও পুরস্কারকে অমূল্য ও অতুল্য গৌরবান্বিত জ্ঞান করিতেছে—যখন দেখিবেন এই মেলাকে স্বজাতীয় গৌরবভূমি বলিয়া সকলের প্রত্যয় জন্মিয়াছে, তখন জানিবেন এই নবরোপিত বৃক্ষের ফল লাভ হইল।"

তৃতীয় অধিবেশন, ১৮৬৯

জাতীয় মেলার তৃতীয় অধিবেশন হয় বেলগাছিয়া উদ্যানে পর বৎসর চৈত্র-সংক্রান্তিতে। পূর্ব্ববারের কর্ম্মপদ্ধতিই অনুসৃত হইল। এবারেও

প্রধান বক্তা ছিলেন মনোমোহন বসু। সভাপতি হইয়াছিলেন সুপ্রসিদ্ধ ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়। এবারকার প্রদর্শনীটিকে অধিকতর সুষ্ঠু করিবার চেষ্টা হয়। নিম্নলিখিত বিভিন্ন শ্রেণীর কারু ও চারু শিল্প প্রদর্শিত হয়:

শিল্প—(১) স্ত্রীলোকদিগের সূচি নির্ম্মিত পশমের ও পুঁতির কার্য্য, (২) ছাচ ও খয়েরের গঠন, (৩) জামা, চাপকান, রুমাল, পেশোয়াজ, উড়নী, সাটী ইত্যাদি, (৪) কুম্ভকারদিগের নির্ম্মিত নানাবিধ ফল, (৫) নদীয়ার বাজার, (৬) নানাপ্রকার পুতুল, (৭) চিত্র, (৮) বারাণসী কাপড়, (৯) চীনদেশীয় নানাপ্রকার রেশমী কাপড়, (১০) ঢাকাই স্বর্ণকারদিগের নানা প্রকার রূপা ও সোনার গঠন, (১১) নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র, (১২) নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র, (১৩) ফোয়ারা, (১৪) ভাস্করীয় প্রতিমূর্ত্তি।

উদ্ভিজ্জাদি—ফল, ফুল, মূল, চারা, শস্য, বীজ; কৃষি ও শিল্পকারক যন্ত্রাদি—লাঙ্গল, চরখা ও তাঁত।

এতদ্ভিন্ন এই সকল ক্রিয়া প্রদর্শিত হয়:

রাসায়নিক ক্রিয়া, কুস্তী, অশ্বচালন, পাইকের খেলা ও বাঁশবাজী।

শিল্পকর্ম্মের জন্য নিম্নলিখিত মহিলাগণকে 'হিন্দু মেলা' নামাঙ্কিত এক একটি রৌপ্যপদক দেওয়া হয়:

"মৃত বাবু আশুতোষ দেবের পরিবার
শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ দত্তের পরিবার
" " রাজেন্দ্র মিত্রের পরিবার
" " সারদাপ্রসন্ন [প্রসাদ ?] গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিবার
" " দীননাথ বসুর পরিবার
" " নীলকমল মিত্রের পরিবার
" " মণিমোহন মল্লিকের পরিবার

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পরিবার
" " হরিবল্লভ বসুর পরিবার
" " প্রসন্নকুমার মিত্রের পরিবার
শ্রীমতী সতী দেবী
কোন্নগর বালিকা বিদ্যালয়।"

এবারেও সাহিত্য-বিভাগে কবিতা ও প্রবন্ধ পঠিত হয়। রজনীকান্ত গুপ্ত এ বৎসর প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই অধিবেশনে কলিকাতার শ্যামবাজার, শ্যামপুকুর ও বাহির সিমুলিয়া ব্যায়াম-বিদ্যালয় হইতে ব্যায়ামকুশলীরা কৃতিত্বের পুরস্কারস্বরূপ হিন্দু মেলা নামাঙ্কিত পদক লাভ করিয়াছিলেন।

এ বৎসরও প্রধান বক্তা নানা বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। প্রদর্শয়িতব্য দ্রব্যাদি সম্বন্ধে তিনি বলেন :

"মেলাস্থলে প্রদর্শয়িতব্য দ্রব্য সম্বন্ধে বক্তব্য এই—যখন জাতি-সাধারণের উন্নতি প্রার্থনীয়, তখন স্বজাতীয় শিল্পীগণের হস্তসম্ভূত ও যন্ত্রসম্ভূত দ্রব্যাদি প্রদর্শন করাই সর্ব্বাগ্রে উচিত। আমাদের রমণীগণ বিলাতী আদর্শানুবর্ত্তিনী হইয়া যে সকল সূচিকর্ম্ম ও সামান্য সামান্য কারুকার্য্য প্রস্তুত করিতেছেন এবং যে সকল ইউরোপীয় প্রতিরূপ দেখিয়া চিত্র করিতে শিখিতেছেন, তাহার প্রদর্শন দ্বারা সম্যক্ ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। ব্যবহার পক্ষে সেই সকল শিল্পকর্ম্মের উপযোগিতা অতি অল্প—না সংসারের কাজে লাগে, না সমাজের উপকারে আইসে ...যাহাদিগের পূর্ব্ব-সমাজ ও পূর্ব্ব-সভ্যতার অনিবার্য্য পরাক্রম অদ্যাপি দেদীপ্যমান আছে, তাহাদের মধ্যে বিপরীত ভাবাপন্ন অপর দেশীয় সভ্যতার প্রচলন শুভও নয়, সুসাধ্যও নয়, সুসিদ্ধ হইবারও নয়। বরং পূর্ব্বকার সেই সকল শিল্পাদির সংশোধন ও উন্নতি করিবার চেষ্টা করা

রাজনারায়ণ বসু

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

উচিত। এবং যদি বিদেশীয় এমন কোনো কারুকার্য্য থাকে, যাহা আমাদের সংসারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং সুষমা ও রুচিবর্দ্ধক, তবে তাবন্মাত্রকেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। শুধু স্ত্রী-শিল্প কেন? সাধারণ শিল্প সম্বন্ধেও এই কথা খাটিতে পারে। ফলতঃ সকল বিষয়েই এই সিদ্ধান্তটি স্মরণ রাখিতে হইবে, যে, ইউরোপীয়দের স্বাবলম্বন ও উদ্যোগটি আমাদের অনুকরণীয় বটে, কিন্তু কার্য্যসাধন প্রণালী ও ঘর সংসারের রীতি নীতি সম্যক্ গৃহীতব্য নহে। এই মীমাংসাকে সম্মুখে রাখিয়া এই মেলার প্রদর্শন-গৃহ সজ্জিত করা উচিত। বিশেষতঃ যখন স্বদেশীয় লোক ও স্বদেশীয় উদ্যোগ দ্বারা স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনোদ্দেশ্যেই ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন অগ্রে স্বদেশীয় শিল্প-বিদ্যার সংস্কার, উত্থান ও নবযৌবন সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করাই অত্যাবশ্যক হইতেছে।"

জাতীয় মেলার মুল উদ্দেশ্য সাধারণের মধ্যে স্বাজাত্যবোধ বা স্বজাতি ধর্ম্মের উন্মেষ সাধন। এ সম্বন্ধে মনোমোহন বলেন:

"সামাজিক উন্নতি বলাতে সমাজের নিয়মাদি পরিবর্ত্তন অথবা নূতন প্রথা প্রচলন দ্বারা সমাজের উন্নতি সাধন করা এ মেলার উদ্দেশ্য নহে; সাধ্যায়ত্তও নহে। সমাজবন্ধন দৃঢ় করা এবং সামাজিকতার নষ্টোদ্ধার করাই সার অভিপ্রায়।...সে সামাজিকতার অন্য নাম জাতিধর্ম্ম। সেই স্বজাতিধর্ম্ম আমাদিগের অনৈক্যতা কারাগারে পরবশ্যতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ আছে, তাহাকে মুক্ত করা সর্ব্বপ্রযত্নে বিধেয়।...স্বজাতীয় সকল শ্রেণীস্থ লোকের একত্র অধিবেশন, পরস্পর সৎসম্ভাষণ, পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের মনোগত ভাব বিনিময়, গত সম্বৎসর মধ্যে সমাজের কি বা উন্নতি আর কি বা অনুন্নতি হইয়াছে তদালোচনা পূর্ব্বক উন্নতিকে উৎসাহ দেওয়া আর অনুন্নতিকে

নিরুৎসাহ করা এবং স্বজাতীয়ের প্রতি স্বজাতীয়ের অনুরাগ বর্দ্ধন ও স্বজাতীয় শিল্প সাহিত্যাদির প্রতি সমুচিত আস্থা জন্মাইয়া দেওয়া যখন মেলার কার্য্য হইল, তখন এই মেলা যে সামাজিকতা উদ্ধারের যোগ্য এবং স্বাবলম্বনরূপ অমূল্যনিধির আকরস্থল হইবে তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।”

বক্তৃতার উপসংহারে মনোমোহন গুণী, মানী, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, কবি, সাহিত্যিক, বক্তা, সঙ্গীতজ্ঞ, উদ্ভিদবিদ্, উদ্যানতত্ত্ববিশারদ, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী প্রভৃতি প্রত্যেককেই নিজ নিজ কার্য্যদ্বারা জাতীয় মেলার আয়োজন ও উদ্দেশ্য সার্থক করিবার জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করিতে আহ্বান করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

জাতীয় মেলার উৎপত্তি ও প্রথম তিন অধিবেশন সম্পর্কে পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। ইহার তৃতীয় বৎসরে, ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মে, মাত্র আটাশ বৎসর বয়সে সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়। গণেন্দ্রনাথ বলিষ্ঠ, কর্ম্মিষ্ঠ, সংগঠনশক্তি সম্পন্ন ও সাহিত্যিক গুণপনা-বিশিষ্ট ছিলেন। জাতীয় সঙ্গীত, ব্রহ্ম সঙ্গীত, বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের অনুবাদ প্রভৃতি তৎ-রচিত যাহা কিছু প্রকাশিত হইয়াছে সকলই তাঁহার সাহিত্যিক কৃতিত্বের পরিচায়ক। জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে নাটক অভিনয়ের ব্যাপারেও তিনি অগ্রণী ছিলেন। সকল কার্য্যেই তিনি জ্যেষ্ঠতাত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে জাতীয় মেলা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল বটে, কিন্তু ইহার পর হইতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মেলার কার্য্যে যেরূপ একনিষ্ঠভাবে ব্রতী হইলেন তাহাতে ইহার উত্তরোত্তর উন্নতিই হইতে লাগিল। গণেন্দ্রনাথের শূণ্যপদে সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়দ্বয়। জাতীয় মেলার প্রতিষ্ঠার সময় হইতে দ্বিজেন্দ্রনাথ নবগোপাল মিত্রের একজন প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। পূর্ব্ব অধ্যায়ে তাঁহার স্মৃতি-কথা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়াছি। তিনি মেলার সঙ্গে কতখানি সূক্ষ্মভাবে যুক্ত ছিলেন, তাঁহার কথায় কিঞ্চিৎ বক্রোক্তি থাকিলেও, নিম্নের অংশ হইতে তাহা বিশেষ রূপে জানা যায়ঃ

"সে [নবগোপাল] একটা মেলা বসাইবার কথা বলিল,—তাঁতি কামার, কুমার ইত্যাদি লইয়া। আমি বলিলাম,—'ওসব তো দেশের

সকলের জানা আছে; দেশী Painting দেখাতে পার?' সে এক Painter নিযুক্ত করিয়া ছবি আঁকাইল। মেলার ক্ষেত্রে গিয়া দেখি, প্রকাণ্ড ছবি। ব্রিটানীয়ার সম্মুখে ভারতবাসী হাতজোড় করিয়া বসিয়া আছে। আমি বলিলাম—'উল্টে রাখ উল্টে রাখ; এই তুমি দেশী Painting করাইয়াছ! আর আমাদের নেশন্যাল মেলায় এই ছবি রাখিয়াছ?' ছবিখানা সরাইয়া উল্টাইয়া রাখা হইল।...একটা নেশন্যাল কাগজ বাহির করিল, কিন্তু মোটেই সুপাঠ্য নয়।* কিন্তু নবগোপালের সময় থেকে এই নেশন্যাল কথাটা দাঁড়াইয়া গেল। নেশন্যাল সঙ্গীত রচনা হইতে আরম্ভ হইল।"†

---

* সুপাঠ্য না হইলেও স্বাজাত্যবোধের উন্মেষে 'নেশন্যাল পেপারে'র কৃতিত্ব যে অসামান্য ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সপ্তমবর্ষপূর্তি উপলক্ষে পত্রিকাখানি লেখেন:

It is a sufficient consolation to us to think that since we have begun our career, a great change has taken place in the minds of the educated youths of Bengal. The tide of denationalisation has sustained an ebb. A happy reaction has taken place in native feelings. People have begun to disbelieve in the theory that for a nation's progress they have simply to learn the art of borrowing. They have firmly begun to belive in the doctrine that to secure everlasting good to themselves, they should have a basis of their own.

It is a still greater consolation to us to think that since we have begun our career, a great movement has found its footing here—we mean the great movement of the National Gathering, which has roused the sleeping energies of the people and stimulated their physical activity, which has afforded an impetus to the advancement of our national art and industry and which, should God grant it a long life, will doubtless bring an incalculable amount of good to our countrymen.

—*The National Paper*, August 7, 1872.

† পুরাতন প্রসঙ্গ (দ্বিতীয় পর্য্যায়)—বিপিনবিহারী গুপ্ত, পৃ. ২০৬-৭।

দ্বিজেন্দ্রনাথও জাতীয় মেলা উপলক্ষ্য করিয়া নেশন্যাল বা জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিলেন। তাঁহার একটি সঙ্গীত এখানে উদ্ধৃত করিলাম। ইহা জাতীয় মেলায় গীত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়:

মলিন মুখ-চন্দ্রমা, ভারত তোমারি,
রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচন-বারি।
চন্দ্র জিনি কান্ত নিরখিয়ে, ভাসিতাম আনন্দে,
আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি!
এ দুঃখ তোমার হায় রে সহিতেনা পারি!

চতুর্থ (১৮৭০) হইতে সপ্তম অধিবেশন (১৮৭৩) পর্য্যন্ত চারি বৎসর কাল দ্বিজেন্দ্রনাথ জাতীয় মেলার সম্পাদক ছিলেন। এই সময় মধ্যে তাঁহার পরামর্শে এবং নবগোপালের চেষ্টা-উদ্যোগে এই মেলা একটি শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট জাতীয় প্রতিষ্ঠান হইয়া দাঁড়াইল। জাতীয় মেলা বাৎসরিক অনুষ্ঠান, কিন্তু বর্ষমধ্যে ইহার উদ্দেশ্য প্রচার ও তদনুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য নেশন্যাল সোসাইটি বা জাতীয় সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সভায় সম্বৎসর ধরিয়া জাতীয় উন্নতিমূলক কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি নানা বিষয়েই আলোচনা হইতে লাগিল। জাতীয় মেলা ও জাতীয় সভা সম্পর্কে নবগোপাল মিত্রের কৃতিত্বের কথা-প্রসঙ্গে মনোমোহন বসু সম্পাদিত 'মধ্যস্থ' (ফাল্গুন ১২৮০) বলেন:

"কিন্তু জাতীয় ভাব ও জাতীয় অনুষ্ঠানের বিষয় একা তাঁহার গুণানুবাদ করিলেই পর্য্যাপ্ত হয় না। সদ্বিদ্যাবিশারদ নিয়ত-স্বদেশ-হিতৈষী প্রসিদ্ধনামা বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নামও সর্ব্বাগ্রে গণনীয়। রোম নগরের এক সেনাপতিকে তরবার, অন্যকে ঢাল বলিয়া যেমন উপমা দেওয়া হইত, আমাদিগের বর্ত্তমান জাতীয় অনুষ্ঠান পক্ষে ঐ উভয় মহাশয়ই সেইরূপ সমহিতকারী হইতেছেন।"

চতুর্থ অধিবেশন, ১৮৭০

চতুর্থ অধিবেশন হইতে জাতীয় মেলার অনুষ্ঠান সম্পর্কে কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। চৈত্র-সংক্রান্তির পরিবর্ত্তে এই বৎসর হইতে সাধারণতঃ মাঘ-সংক্রান্তি ও পরবর্ত্তী দিবসে মেলা হইতে থাকে।* এই বৎসর হইতে মেলার কোন মুদ্রিত কার্য্য-বিবরণ পাই নাই। সমসাময়িক সংবাদপত্রে যতটুকু বিবরণ বাহির হইয়াছে তাহাই বর্ত্তমানে একমাত্র সম্বল। চতুর্থ অধিবেশন সম্পর্কে ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৭০ দিবসীয় 'অমৃতবাজার পত্রিকা' লেখেন :

"জাতীয় মেলা। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ইহার পরিণাম নহে। ইহা সহস্র২ বার বিয়োজিত, গঠিত, পরিবর্ত্তিত হইলে, যদি কস্মিন-কালে ইহা চরম অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ইহা যত আলোচিত বিলোচিত হয়, তত মঙ্গল এবং এই নিমিত্ত যেখানে যখন যে কোন রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, সেখানেই প্রায় শুভকর ফল দেখা গিয়াছে।

"আমাদের সমাজ অনেক অস্বাভাবিক ও বিজাতীয় শাসন সহ্য করিয়াছে এবং তাহাতে ইহাকে একরূপ নির্জ্জীব ও নিস্তেজ করিয়া

* 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' (১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭০) পাঠে জানা যায় যে, ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট চড়কপূজার পিঠ ফোঁড়া, বাণ ফোঁড়া প্রভৃতি শারীরিক কষ্টদায়ক প্রথা সকল তুলিয়া দিলে, এই সময় হইতে তদ্বিনিময়ে চৈত্র-মেলার সূত্রপাত হয়। পত্রিকা-খানি লেখেন :

"কলিকাতার সুসভ্য যুবকবৃন্দ গাজনপর্ব্বের বিনিময়ে সেই বৎসর অর্থাৎ ১৮৬৭ খ্রীঃ হইতে চৈত্রমেলা বাহির করিয়াছিলেন ;...

"যখন চড়কপর্ব্বের বিনিময়ে চৈত্রমেলার সৃষ্টি হইয়াছে, তখন এবৎসর একেবারে তাহার নাম ও দিন পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। লোকের কষ্ট হয় বলিয়া শাস্ত্রসঙ্গত পর্ব্বদিন পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায় না।"

তুলিয়াছে। একটু নাড়াচাড়া না করিলে আবার উহার চৈতন্য জীবন্ত হওয়ার সম্ভব নাই…।

"জাতীয় মেলাটি এইরূপে আমাদের সমাজকে কতক পরিমাণে উন্নতির অভিমুখে লইতেছে, কিন্তু ইহার উদ্দেশ্যও মহৎ, সুতরাং ইহাতে যত কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে আমরা তত বিশেষ উপকৃত হইব।

"এ বৎসর চৈত্র মাসে না হইয়া ফাল্গুন মাসে হওয়ায় মেলায় উপস্থিত সকলে গ্রীষ্ম কর্ত্তৃক তত কষ্ট সহ্য করেন নাই। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষাও এবার আয়োজনের কতক উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে।…

"মেলাতে এই কয়েকটি বিষয়ের প্রদর্শনী হয়। কথকতা, রাসায়নিক প্রদর্শন, লিখিত বক্তৃতা পাঠ, গান, কৃত্রিম ফল ফুল, কৃষি উৎপন্ন দ্রব্য ও কৃষি উপযোগী যন্ত্রের প্রদর্শন, বাংলা পুস্তক, তদ্ভিন্ন ফল ফুল, চারুকার্য্য এবং শেষ দিন কুস্তি লাঠিখেলা, নৌকার বাজী প্রভৃতি হয়।"

দ্বিজেন্দ্রনাথ যেমন মেলায় স্বদেশীয় চিত্র প্রদর্শনের অধিকতর পক্ষপাতী ছিলেন, 'অমৃতবাজার পত্রিকা' তেমনি ইহাকে স্বদেশীয়দের বলবীর্য্যের প্রকাশ-ক্ষেত্র করিতে চাহিয়াছিলেন। মেলায় প্রদর্শিত বিষয়াদির সমালোচনা প্রসঙ্গে পত্রিকা লেখেন :

"উপরের তালিকাটি দেখিলেই সহসা বোধ হয় এটি ক্রমে ইংরাজ মেমদিগের ফ্যান্সি ফিয়ারের ন্যায় একটি আমোদের স্থান হইয়া উঠিয়াছে।"

মেলা সম্পর্কে পত্রিকার পরামর্শ প্রণিধানযোগ্য :

"আমাদের দেশীয়গণের বুদ্ধির উৎকর্ষ অনেক হইতেছে। এ সঙ্গে শারীরিক বলবীর্য্যের, ব্যায়াম ও শস্ত্র শিক্ষা প্রভৃতির নিতান্ত অভাব এবং এই অভাবের নিমিত্ত আমাদের এত হীনতা। যদি কেহ দেশের মঙ্গল চান, তবে যাহাতে এরূপ হয় সেইরূপ একটি উদ্যোগ করুন। আমরা

বোধ করি কৃষ্ণকামিনীর চারু কার্য্যের পারিপাট্যতার কথা শুনা অপেক্ষা অনেকে 'মেলায় ঘোড় দৌড়ে দুজন বিকলাঙ্গ হইয়াছে, লাঠী খেলায় একজনের মাথা ভাঙ্গিয়াছে, বন্দুক ছুড়াতে একজন মরিয়াছে' শুনিয়া অসংখ্য গুণে সন্তুষ্ট হইতেন।"

নেশন্যাল সোসাইটি বা জাতীয় সভা

এবারকার মেলা অনুষ্ঠানের পর হইতেই নেশন্যাল সোসাইটি বা জাতীয় সভারও কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রতি মাসে এই সভার একটি করিয়া অধিবেশন হইত। প্রথমে চারিটি বক্তৃতা দানের ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম বক্তৃতা হইবার পর 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (২৪ মার্চ্চ, ১৮৭০) এ সম্বন্ধে লেখেন :

"সম্প্রতি বাঙ্গলায় যে চারিটী বক্তৃতা হইতেছে, তাহার প্রথম বক্তৃতা সীতানাথ বাবু দিয়াছেন। প্রথম বক্তৃতা যন্ত্রবিষয়ক, সীতানাথ বাবু কর্ত্তৃক। দ্বিতীয় বক্তৃতা বাণিজ্যবিষয়ক যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্ত্তৃক, তৃতীয় বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রাযন্ত্র-বিষয়ক, চতুর্থ বক্তৃতা বাবু সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্ত্তৃক ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতবিষয়ক। সীতানাথ বাবুর বক্তৃতা হইয়া গিয়াছে। তিনি বক্তৃতা স্থলে তাঁহার এয়ার পাম্প যন্ত্র আর তাঁহার সৃষ্ট নূতন একটী তাঁত দেখান। তিনি বলেন তন্ত্ত যন্ত্রে একটী লোকে ৪ জনের কাজ করিতে পারে।"

এই উদ্ধৃতির সীতানাথ বাবু—সীতানাথ ঘোষ। তিনি জাতীয় সভার বিভিন্ন অধিবেশনে এবং জাতীয় মেলার প্রকাশ্য অধিবেশনেও বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে একাধিক বক্তৃতা করেন। বিজ্ঞানের, বিশেষতঃ ব্যবহারিক বিজ্ঞানের গবেষণায় তিনি আমাদের পথ-প্রদর্শক। তিনি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তেও তাঁহার গবেষণালব্ধ জ্ঞানের উপর বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার একটু পরিচয় প্রদান

এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বক্তৃতার কথা প্রসঙ্গেই 'অমৃতবাজার পত্রিকা' সীতানাথ সম্বন্ধে উক্ত দিবসেই লিখিলেন :

"বাবু সীতানাথ ঘোষের বাটি যশোহর, রায়গ্রামে। অবস্থা ভাল না থাকায় এবং অন্যান্য কারণ বশতঃ তিনি কলেজে তাঁহার পাঠ সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। এক্ষণে কলিকাতায় অল্প বেতনে কেরাণিগিরি করিতেছেন। সীতানাথবাবুর বয়স অল্প কিন্তু অতি শৈশব কাল অবধি তাঁহার মনের গতি এক দিকে—নূতন যন্ত্র নির্ম্মাণ করা।

"আমাদের যতদূর স্মরণ হয়, সীতানাথ বাবুর প্রথম যত্নের ফল, নূতন একরূপ ঘানি গাছ।...আমরা তাঁহার দুইটি যন্ত্রের চিত্র দেখিয়াছি, একটি এয়ার পম্প, আর একটি এঞ্জিন। এয়ার পম্পে তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি তাহার প্যাটেণ্ট লইতে পারেন, কিন্তু তাহাতে লাভ কি। তাঁহার এয়ার ইঞ্জিন সম্পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু যতদূর হইয়াছে তাহাতে তাঁহার বিস্তর বুদ্ধির পরিচয় আছে। এ যন্ত্রের উদ্দেশ্য বাষ্পের পরিবর্ত্তে সামান্য বায়ু ব্যবহার করা ও বায়ুর স্থিতি-স্থাপকত্ব শক্তি কর্ত্তৃক যন্ত্রের গতি দেওয়া।"*

জাতীয় সভায় প্রদত্ত বক্তৃতাসমূহ নানা দিক হইতেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এবং কোন কোন বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইত। যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক বক্তৃতাটিও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। জাতীয় সভার পঞ্চম অধিবেশনে বক্তৃতার বিষয় ছিল 'জীবন ও বহির্জগতের সঙ্গে উহার কি সম্বন্ধ'। ১৮ আগষ্ট, ১৮৭০ এর 'অমৃতবাজার পত্রিকা' লেখেন :

* সীতানাথ ঘোষের কার্য্যকলাপের সংক্ষিপ্ত পরিচয় যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার 'প্রবাসী'—১৩১৮, ফাল্গুন, পৃ. ৪৯৩ এবং ১৩১৯, জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ২১৩-৫এ দিয়াছেন। সীতানাথ ঘোষ *Medical Magnetism* গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে তিনি এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন : "Founder of Electropathy—Magnetic System of Treatment in India."

"জাতীয় সভার পঞ্চম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বাবু রাজকৃষ্ণ মিত্র 'জীবন ও বহির্জগতের সঙ্গে উহার কি সম্বন্ধ,' এ বিষয়ে একটি বক্তৃতা পাঠ করেন। মনুষ্যের জীবন ধারণের নিমিত্ত বহির্জগৎ হইতে কি কি প্রয়োজন সেইগুলি তিনি বর্ণন করেন এবং প্রয়োজন মত তাঁহার প্রস্তাবিত বিষয়ের স্থান বিশেষ রাসায়নিক প্রদর্শন দ্বারা বুঝাইয়া দেন। তাহার পরে বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার কৃত চরকা প্রদর্শন করেন এবং বাবু সীতানাথ ঘোষ এই কলটিতে কত উপকারের সম্ভাবনা তাহা সভ্যগণকে বুঝাইয়া দেন।"

ইহার পর এ বৎসরে জাতীয় সভার আর কোন অধিবেশনের সন্ধান পাই নাই। তবে এই সময়ে জাতীয় মেলার উদ্যোক্তারা অন্য কোন কোন বিষয়েও স্বদেশবাসীর উপকার বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন। তাঁহাদের দ্বারা বিধবাদের শিল্পাদি কর্ম্মে সাহায্য বিষয়ে ১ ডিসেম্বর, ১৮৭০এর 'অমৃতবাজার পত্রিকা' লেখেন :

"জাতীয় মেলার উদ্যোগ ও যত্ন দেখিয়া আমাদের প্রত্যাশা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। সম্প্রতি ইহা কর্ত্তৃক একটি সদনুষ্ঠান হইয়াছে। এদেশের বিধবা স্ত্রীরা অনেক স্থলে নিতান্ত সহায়শূন্য অবস্থায় পতিত হয়। ইহাদিগের জীবনোপায়ের নিমিত্ত মেলা কর্ত্তৃক একটি ফণ্ড খোলার যত্ন হইতেছে। আপাতত ৫০০৲ টাকা লইয়া কাজ আরম্ভ হইবে ও ২৫ জন বিধবাকে ইহা হইতে ২৫৲ টাকার মূল্যের জিনিসপত্রাদি দেওয়া হইবে। তাহারা ইহার দ্বারা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া হয় জাতীয় মেলা কি ইহার মাসিক সভাতে পাঠাইয়া দিবেন। সেখানে ইহা বিক্রয় হইয়া যাহা পাওয়া যাইবে তাহার মধ্য হইতে সভা কর্ত্তৃক যে টাকা পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছিল, তাহা বাদে যাহা থাকিবে তাহাদিগকে দেওয়া হইবে।"

পঞ্চম অধিবেশন, ১৮৭১

ইহার পর মেলার পঞ্চম অধিবেশনের উদ্যোগ-আয়োজন হয়। সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক এবং সহকারী সম্পাদক নবগোপাল মিত্রের স্বাক্ষরে বিজ্ঞপ্তি যথারীতি প্রচারিত হইল। নূতন গ্রন্থ, উত্তম শিল্প, কৃষিদ্রব্য, বাজার, দোকানদার, গীতবাদ্য, খেলা, নিলাম প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের বিষয় নির্ব্বাচনের ভার বিভিন্ন ব্যক্তি বা মণ্ডলীর উপর অর্পিত হইল। বিজ্ঞাপনটির 'নূতন গ্রন্থ' অনুচ্ছেদে লিখিত হইয়াছিল:

"যাঁহারা সংস্কৃত বা বাঙ্গলা ভাষায় কোন প্রকার উত্তম গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তাঁহারা সেই সকল গ্রন্থ মেলার অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্ব্বে ন্যাসনেল প্রেসে নিম্ন স্বাক্ষরকারীদিগের নিকট পাঠাইয়া দিলে যদি তৎসমুদয় মেলার অধ্যক্ষ সভার বিবেচনায় নূতন ভাবাত্মক ও দেশের যথার্থ হিতজনক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে মেলার সময় বিশেষ সম্মানসূচক চিহ্ন ও সাধ্যমতে অন্য প্রকার সাহায্য প্রদত্ত হইবে, যাঁহারা উক্ত প্রকারের কোন গ্রন্থ লিখিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন কিন্তু অর্থাভাবে মুদ্রাঙ্কণ করিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদিগের পাণ্ডুলিপি যদি উক্ত সভার মনঃপূত হয় তবে তাঁহাদিগকে মুদ্রাঙ্কণের নিমিত্ত সাধ্যমতে অর্থসাহায্য প্রদত্ত হইবে।"

'অমৃতবাজার পত্রিকা' (২০শে জানুয়ারী, ১৮৭১) বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করিয়া লিখিলেন:

"অন্য স্তম্ভে পাঠক চৈত্র মেলা, এখন মাঘ মেলা, সম্বন্ধে একটী বিজ্ঞাপন দেখিবেন। আমরা এই বিজ্ঞাপনটির নিমিত্ত তিন স্তম্ভ পূর্ণ করিয়াছি, ইহাতে পাঠক বুঝিবেন যে এ বিষয়টিকে আমরা কত গুরুতর মনে করি। এ মেলাটি শুধু কলিকাতাবাসীদিগের নিমিত্ত নহে, সমস্ত বাঙ্গালার জন্যেই। আমরা ভরসা করি দূর দেশ হইতে

ভদ্রলোক মেলা দেখিতে যাইবেন, যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। মেলার কর্তৃপক্ষীয়দিগকে আমরা আর বৎসর যাহা বলিয়াছিলাম এ বৎসর সে অনুরোধ করি। তাঁহারা যেন মানসিক উন্নতিকে আনুষঙ্গিক করিয়া শারীরিক উন্নতিকে প্রধান সংকল্প করেন।"

এ বৎসর জাতীয় মেলা অনুষ্ঠিত হয় ৩০শে মাঘ, ১লা ও ২রা ফাল্গুন (১১, ১২, ১৩ই ফেব্রুয়ারী) কলিকাতা হইতে তিন ক্রোশ দূরে হীরালাল শীলের বাগানে। 'সুলভ সমাচার' (২১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭১) মেলার এই অধিবেশন সম্পর্কে লিখিলেন:

"এ মেলা এ বৎসর নৈনানে হীরালাল শীলের বাগানে গত ৩০শে মাঘ শনিবার, এবং রবিবার ও সোমবার এই তিন দিন হইয়াছিল। কলিকাতার অনেক বড় বড় ভদ্রলোক এবং ইংরেজ ও অনেক সামান্য লোকেরাও মেলাটি দেখিতে গিয়াছিলেন। আমরাও এক দিন ইহা দেখিতে গিয়াছিলাম, আমাদের মনে তাহা কিরূপ লাগিয়াছে পাঠকগণকে তাহা জানাইতে ইচ্ছা করি।

"দেশের যাহা কিছু ভাল সেইগুলি সব একস্থানে একত্র করিয়া দেখাইবার জন্য হিন্দু মেলা হইয়াছে, ইহাতে দেশীয় লোকেরা, যাঁহারা দেখিবেন তাঁহাদের মনে আহ্লাদ হইবে যে লোকে তাঁহাদের জিনিষ ও ব্যাপার সকল দেখিয়া ভাল বলিতেছেন। এ সকল মেলার দস্তুর এই যে ভাল ভাল জিনিষগুলি আবার লোকে পয়সা দিয়া ক্রয় করিয়া লইয়া যায়, তাহাতে লাভের উপায়ও বিলক্ষণ হয়।...

"হিন্দু মেলাতে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের তয়েরী কার্পেটের অনেকগুলি ভাল ভাল কাজ সংগ্রহ করা হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। অনেকগুলি একেলে ধরণের চিত্র করা ভাল ভাল ছবি জড় করা হইয়াছিল। মালতী মাধব সংক্রান্ত ছবিখানি মন্দ নহে। তানপুরা, সেতার, এসরাজ, বীন প্রভৃতি বড় বড় এদেশের

তারের যন্ত্রগুলি এত মস্ত যে দেখিলে "বাপ" করিয়া উঠিতে হয়। কাপড়ের পাড় সকলে কেমন সব গান লিখা! রকম রকম চাল, রকম রকম ডাল প্রভৃতি অনেক প্রকার শস্য, এবং কলম করা নানা প্রকার ফল ফুলের গাছও মন্দ সংগ্রহ হয় নাই। কমলালেবুর কলমে দুই চারিটি করিয়া কমলালেবু দেখিতে কেমন সুন্দর। আমাদের বহুকালের বৃদ্ধ মাতামহী চরকা সমস্ত দিন ঘেনর ঘেনর করিয়া চালাইলেও তাহার নিকট হইতে চার আনার সূতা পাওয়া মুস্কিল, কিন্তু একটি ভদ্রলোক নূতন রকমের একটি সূতার কল প্রস্তুত করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহাতে তিন জায়গায় চাকা ঘুরিয়া সূতা হইতেছে এবং তাহা আপনা আপনি জড়াইয়া যাইতেছে। বার বার হাত উঁচুনীচু করিয়া একবার সূতা কাটা একবার সূতা জড়ান সে ভোগ ইহাতে ভুগিতে হয় না। খানিকটা তুলা থেকে এক সময়েই সূতা কাটা ও জড়ান হইতেছে। একটি ত্রুটি দেখা গেল যে সূতা বরাবর এক আঁচের হইতেছে না। এক একবার মোটা এবং এক একবার সরু হইয়া পড়িতেছে। আশা করি এ দোষটির শীঘ্রই নিরাকরণ হইবে। সেই লোকটি আবার একটি নূতন রকমের তাঁতের কলও করিয়াছেন, কিন্তু এ বিষয়ে তিনি এখনও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। মেলাতে বিদ্যুতের আলোর অনেক তামাসাও দেখান হইয়াছিল এবং একজন আগুন গিলিয়াছিল ও কাঁচ চিবাইয়া খাইয়াছিল। সর্দ্দারের খেলা এবং মল্লক্রীড়াও হইয়াছিল। পুষ্করিণীতে ভাউলের বাচ, এবং ঘোড়দৌড়ও সামান্য পরিমাণে হইয়াছিল। আমরা দেখিলাম একটি ভদ্রলোক একটি উচ্চ জায়গায় দাঁড়াইয়া সহজ বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিতেছেন।...বাবু নবগোপাল মিত্রের নিঃস্বার্থ যত্নে ও বিশেষ চেষ্টায় আমরা এই সুন্দর মেলাটি দেখিলাম, তাঁহাকে আমরা ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না।"

অতঃপর 'সুলভ সমাচার' মেলার গুটিকতক ত্রুটীর প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহার মতে,

"মেলার ছবিগুলি সাজান হয় নাই, উচিত ছিল যত ভাল ভাল ছবি সব একজায়গায় সাজান। আর মেলাতে অতি অল্প সামগ্রীই সংগ্রহ হইয়াছিল, কুমারের জিনিষ, কিম্বা সেকরা, ছুতার, কামার, কাসারি প্রভৃতির কোন ভাল অলঙ্কার বা প্রয়োজনীয় দ্রব্যও আমরা কিছু দেখিলাম না; মেলাটি এমনই হওয়া চাই যে সকল লোকেই আপনাদের ভাল ভাল জিনিষ দেখাইয়া উৎসাহ পায়। এদেশের কোন ভাল পশু-পক্ষীও সংগ্রহ হয় নাই।"

'সুলভ সমাচার' এখানে যে নূতন ধরণের চরকা ও তাঁতের কথা বলিয়াছেন তাহা যশোহর-নিবাসী সীতানাথ ঘোষ কৃত। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' বাঙালী জাতির দৈহিক শক্তি ফিরাইয়া আনিতে উৎসুক। তাই তিনি বরাবর মেলার এই দিকটির উৎকর্ষের প্রতি জোর দিয়াছেন। পত্রিকা (২ মার্চ্চ, ১৮৭১) জাতীয় মেলার কথা সাধারণ ভাবে কিছু বলিয়া এই বিষয়টি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন। তাঁহার কথা সংক্ষিপ্তাকারে এখানে প্রদত্ত হইল :

"জীব কাহাকে বলে, যাহারা অন্যকে জীবন দিতে পারে। মাঘ মেলা দেখিলে যে হিন্দুদের জীবন আছে, বোধ হয়। দশ জনে চাঁদা করিয়া একটি কাজে সাহসপূর্ব্বক প্রবর্ত হওয়া যায়, মাঘ মেলার চাঁদা নাই। এরূপ কার্য্যের ভিত্তিভূমি সুদৃঢ় নহে। মাঘ মোলাটি হইয়া গেলেই চিন্তা হয়, আর বৎসর কি এইরূপ আবার হইবে?…কিন্তু তবু ত মেলা চলিতেছে…তবু ত মেলার ক্রমেই শ্রীবৃদ্ধি। ইহাতেই বোধ হয় হিন্দুরা অদ্যাপি সজীব আছে কারণ তাহারা জীবন দিতে পারে।

"আমাদের দেশীয়েরা যেন মেলার প্রধান উদ্দেশ্য ভুলেন না। শিল্পবিদ্যা উন্নতির নিমিত্ত মেলা নহে, শারীরিক বল, মাংসপেশী সুদৃঢ় করিবার

নিমিত্ত। শিল্পবিদ্যা উন্নতি এই সঙ্গে হয়ত ভালই। শারীরিক বল বৃদ্ধির নিমিত্ত আমাদের বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। ব্যায়াম চর্চ্চার প্রথম সোপান নবগোপালবাবু দেখাইয়াছেন।...ব্যায়াম চর্চ্চা করিবার এক উত্তেজক মাঘ মেলা তাহাও তাঁহারই যত্নে হইয়াছে, কিন্তু দেশ সমেত সকলে না মিশিলে একা নবগোপালবাবুর দ্বারা কিছু হইবে না। ...[মেলায়] যাঁহারা এই ব্যায়াম চর্চ্চায় কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের নাম প্রকাশ হউক, ইহা লইয়া তর্ক বিতর্ক হউক, তাঁহাদিগের নামে কবিতা বান্ধী হউক, তাহাদিগকে সাধুবাদ করা হউক, এইরূপ ঠিক কাজ করিতে থাকিলে শারীরিক বল যখন গৌরবের বিষয় হইয়া উঠিবে, তখন মেলার উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।"

বলা বাহুল্য, পত্রিকার অভিপ্রায়ানুরূপ না হইলেও, মেলা-কর্ত্তৃপক্ষ প্রতি বৎসরই ব্যায়ামবীর ও কুস্তিগীরদের যথোচিত পুরস্কার প্রদান করিতেছিলেন। মেলার আরম্ভ অবধি শ্যামাচরণ ঘোষ নামক এক ব্যক্তি কুস্তি-কসরৎ আদির জন্য প্রতি বারই পদক পুরস্কার পান। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গের তৎকালীন ছোটলাট সর উইলিয়ম গ্রে শরীর-চর্চ্চায় উৎকর্ষের জন্য মেলার পক্ষ হইতে তাঁহাকে একটি পদক প্রদান করিয়াছিলেন।*

মেলার কার্য্য এই বৎসর হইতে মফঃস্বলেও প্রসারলাভ করিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয় চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুরে স্থানীয় জমিদারগণের সহায়তায় একটি জাতীয় মেলা স্থাপন করেন। এ বৎসর ১লা হইতে ৭ই মে পর্য্যন্ত দিনাজপুরে রাজবাড়ীর সম্মুখস্থ ময়দানে কলিকাতার জাতীয় মেলার আদর্শে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বিবিধ কৃষিদ্রব্য ও শিল্পদ্রব্য এখানে প্রদর্শিত হয়। বিদেশী দ্রব্য

*The National Paper, July 24, 1872.

সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জিত হইয়াছিল। কৃষক ও শিল্পীদের মধ্যে যাহারা উৎকৃষ্ট দ্রব্য উৎপন্ন ও প্রস্তুত করিয়াছিল তাহাদিগকে পাঁচ শত টাকা পরিমিত পারিতোষিক প্রদান করা হয়। উভয়ত্রই মেলা কয়েক বৎসর চলিয়াছিল।

এবারে সম্বৎসর ধরিয়া জাতীয় সভার কতগুলি অধিবেশন হইয়াছিল জানিতে পারি নাই। তবে সীতানাথ ঘোষ *Medical Magnetism* গ্রন্থে এ সনের গ্রীষ্মকালে জাতীয় সভার দুইটি অধিবেশনে প্রদত্ত বিদ্যুৎ সম্বন্ধে পর পর তাঁহার দুইটি বক্তৃতার নিম্নরূপ উল্লেখ করিয়াছেন:

"In the summer of the year 1871, being requested by some of my friends, I delivered two successive addresses at the National Society's meeting in the Calcutta Training Academy's Hall on the ideas I conceived about the electrical and magnetic importance of the said practices."

ষষ্ঠ অধিবেশন, ১৮৭২

মেলার অধিবেশনের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে বিশেষ উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছিল। জাতীয় মেলার এই অধিবেশন হয় মৃত রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের কাশীপুরস্থ বিখ্যাত বাগানবাটীতে যথারীতি মাঘ-সংক্রান্তি ও ১লা ও ২রা ফাল্গুন দিবসে (১১ই, ১২ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারি)। শেষ দিন বড়লাট লর্ড মেয়োর মৃত্যুসংবাদ ঘোষিত হইলে মেলার অধিবেশন এবারকার মত বন্ধ হইয়া যায়। একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, মেলার প্রথম হইতেই সাহিত্য, শিল্প ও ব্যায়াম এই তিনটি জিনিষের উৎকর্ষের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছিল। কারণ জাতীয় উন্নতি বলিতে এই তিনটির উৎকর্ষ ব্যতীত আর কি হইতে পারে? এই অধিবেশনে চারুশিল্প বিভাগে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তৈলচিত্রের জন্য একটি স্বর্ণ পদক এবং
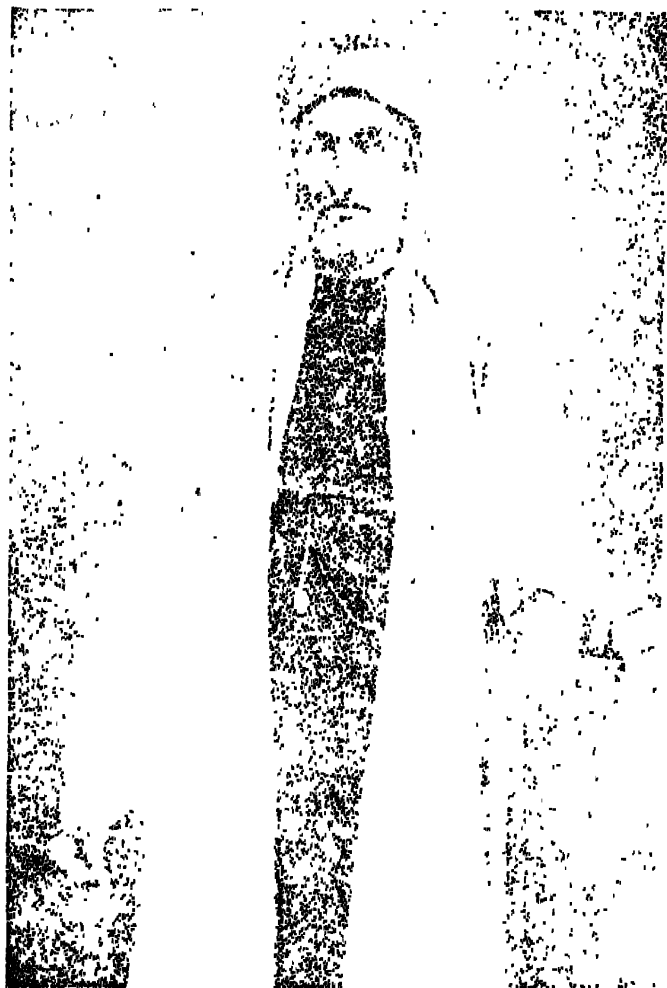
মনোমোহন বসু

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সর্ব্বোৎকৃষ্ট আলো-ছায়াময় চিত্রের জন্য আর একটি রৌপ্যপদক দানের ব্যবস্থা হয়। কৃষিজাত দ্রব্যাদির জন্য তিন শত টাকা পরিমাণ পুরস্কারের বরাদ্দ ছিল। মল্ল, কুস্তী-কসরৎ প্রদর্শক ও ব্যায়ামবীরদের জন্যও যথারীতি পারিতোষিকের বরাদ্দ হয়। জাতীয় মেলায় এবারে উৎকৃষ্ট পুস্তক-লেখক ও প্রবন্ধকারদের পুরস্কার দানের পরিবর্ত্তে ইহাতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হইয়া থাকে তাহা এবং এতদর্থে প্রাপ্ত অন্য টাকা-কড়ি 'হিন্দু প্রদর্শক' পত্রিকার প্রচারানুকূল্যে ব্যয় করা জাতীয় সভার সাহিত্য-বিভাগ ধার্য্য করিয়াছিলেন। তবে মেলার অধিবেশনে সাহিত্য-শাখায় প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ যথারীতি হইয়াছিল। এই অধিবেশনের বিজ্ঞপ্তি হইতে জানা যায়, জাতীয় মেলার সাধারণ সভার অধিবেশন বৎসরে দুই বার হওয়া স্থির হয়। ইহার বিবেচনার জন্য কর্ম্মকর্ত্তৃসভার কার্য্যাবলী ঐ ঐ সময় উপস্থাপিত করার কথা থাকে। কার্য্য-পরিচালনার নিয়মাবলী ধার্য্য করার ক্ষমতাও সাধারণ সভার। সাধারণ সভার সভ্য ছিলেন—বর্দ্ধমানের মহারাজা, রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, রমানাথ ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বিজয়কেশব রায়, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, দুর্গাচরণ লাহা, হীরালাল শীল, কৃষ্ণদাস পাল, প্যারীচরণ সরকার, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়; কোষাধ্যক্ষ ছিলেন—কুমার সুরেন্দ্রকৃষ্ণ এবং গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।*

নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে মেলার প্রকাশ্য অধিবেশন যথারীতি আরম্ভ হইল। রাজা কমলকৃষ্ণ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। সভাপতির পার্শ্বে গণ্যমান্য পণ্ডিত ও বক্তাগণ এবং সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন বসু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপবেশন করেন।

* *The National Paper,* Feb. 7, 1872.

প্রথমেই সাহিত্য বিভাগের কার্য্য অনুষ্ঠিত হইল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মনোমোহন বসু, ঈশানচন্দ্র বসু, বাণীনাথ নন্দী প্রমুখ সাহিত্যিকগণ সার-গর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। কবিতা আবৃত্তি হইল। কেহ কেহ স্বরচিত কবিতাও পাঠ করিলেন।

মেলার দ্বিতীয় কার্য্য শিল্প-প্রদর্শন। এবারে কৃষিজাত দ্রব্য তেমন আসে নাই বটে, কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর চিত্র, খাদ্যদ্রব্য, সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্র, ব্যায়ামাদির জিনিসপত্র এবং বাংলা, সংস্কৃত ভাল ভাল পুস্তক এবারকার প্রদর্শনীর গৌরব বর্দ্ধন করে। শেষোক্ত শ্রেণীতে উপস্থাপিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র-কৃত বঙ্গের কয়েকটি জেলার মানচিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজেন্দ্র মল্লিক জ্বর-রোগ ও সর্প-দংশনের প্রতিষেধক ঔষধ বিতরণ করেন।

তৃতীয় দিনে বড়লাট লর্ড মেয়োর মৃত্যু-সংবাদ ঘোষিত হইলে মেলার অধিবেশন অকস্মাৎ পরিসমাপ্ত হয়। সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মেলা-ক্ষেত্রে লর্ড মেয়োর অপঘাত মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিয়া বক্তৃতা করেন।*

মেলা-ক্ষেত্রে মনোমোহন বসু মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠের কথা বলিয়াছি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত এবারেও তিনি হিন্দু মেলার উদ্দেশ্য সিদ্ধিকল্পে সচেষ্ট হইতে স্বদেশবাসীকে আহ্বান করেন। ভারতবর্ষে কলের গাড়ী, কলের জাহাজ, কলের জল, কলের নলে গ্যাস জ্বালা, কলের তারে সংবাদ আদান-প্রদান কতই না হইতেছে। নগরে নগরে এত সওদাগরী কুঠী, অপর্য্যাপ্ত বাণিজ্যকার্য্য, নীল, চা প্রভৃতির অসামান্য চাষ ও ব্যবসায়, এত বিচিত্র সুরম্য হর্ম্মাকার্য্য, সুচিত্রিত কারুকার্য্য ও চিত্রকার্য্য, কিন্তু এসবে আমাদের কি অধিকার? মনোমোহন বলেন:

"ওহে অহংবাদি সভ্যতাভিমানি নববঙ্গ! তোমরা কিসের বড়াই

---

* *The National Paper,* Feb. 14 and 21, 1872.

করিয়া বেড়াও? তোমরা বাক্যাড়ম্বর ভিন্ন আর কি কাজের যোগ্য? তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ অপেক্ষা তোমরা উন্নত হইয়াছ, একথা কোন্ সাহসে ব্যক্ত কর। যে ইংরাজ জাতির দ্বারা এই সকল কার্য্য হইতেছে, ইহা তাহাদেরি উন্নতি, তোমাদের কি? শ্রীফল পক্ব হইলে বায়সের কি? তাহারা স্বদেশে উন্নতির সঙ্গে বাস করেন, এখানেও সেই উন্নতিকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া স্বদেশে এবং অধীন দেশে, উভয় স্থানেই আপনারা আরো উন্নত হইতেছেন, তোমরা কেবল সাক্ষীগোপাল। তোমরা কেবল দর্শক আর স্তুতিবাদক বৈ আর কি? সুতরাং তোমাদের উচ্চে উত্থান হইল কৈ? তোমাদের প্রখর বুদ্ধিরূপ সুতীক্ষ্ণ বাণ আছে সত্য, কিন্তু প্রাকৃত বিজ্ঞান নামা রাধাচক্রের সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া লক্ষ্যভেদ না করিতে পারিলে সে বুদ্ধি থাকাতে ফল কি?"

মনোমোহন নববঙ্গকে এইরূপ উত্তেজিত করিয়া সৌভ্রাত্রবন্ধনে আবদ্ধ হইবার জন্য দেশের ধনী ও বিত্তশালী ব্যক্তিদের উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন ঃ

"আয়রে সৌভাগ্যশালি প্রিয় পুত্রগণ! আয়রে আমার ধনকুবের প্রধান সন্তানগণ! আয়রে রাজ্যাধিকারি—ভূম্যধিকারি কৃতজ্ঞ কৃতি পুত্রগণ! যদি ভাগ্যক্রমে ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে সৌভ্রাত্রবন্ধনের আর একতা-রূপ অতুল্য একাবলিহার ধারণের সুযোগ পাইয়াছ, তবে বৎসগণ! বৃথা অভিমান, অনর্থগর্ব্ব, সর্ব্বনাশক ইন্দ্রিয়াসক্তির বশীভূত আর থেকো না! স্বদেশানুরাগকে তোমাদের পথ-প্রদর্শক কর, তিনি অচিরে নির্ম্মল আনন্দ মন্দিরে তোমাদিগকে লইয়া যাইবেন। হায় বৎস! তোমাদের প্রতিই তোমাদের অভাগ্যবতী জননীর অধিক আশা ভরসা—মধ্যাবস্থ তোমাদের কনীয়ান্ ভ্রাতারা যেরূপ মাতৃভক্তি পরায়ণ, আর বাসনা ও বিদ্যাবুদ্ধিতে যেরূপ সুযোগ্য, তাহাদের যদি সেইরূপ সম্পত্তিবল, সম্ভ্রমবল,

প্রভুত্ববল থাকিত, তবে বৎস! কোনো চিন্তার বিষয়ই হইত না! তোমরা সহায় না হইলে তাহারা কি করিতে পারে! তোমরা অনুবল হইলে তাহারা অসাধ্যও সাধন ক'রতে পারিবে—যত্নাস্ত্রে সকল বিঘ্নের মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিবে! অতএব প্রাণপ্রতিম প্রিয়তম সন্তানগণ! আর ঔদাস্য নিদ্রায় অচেতন র'হিও না; জননীর দুঃখাবর্জ্জনে আর বিলম্ব করিও না; জাগরুক হও—উত্থান কর—চক্ষুরুন্মীলন কর—পবিত্র প্রতিজ্ঞাজলে অভিষিক্ত হও—স্বাবলম্বন রূপ বসন পরিধান কর—ঐক্যরূপ শিরস্ত্রাণ মস্তকে ধর—আশারূপ আসাগাছটি করতলে লও—ভ্রান্তিগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিস্তীর্ণ কর্ম্মভূমিতে অবতীর্ণ হও—চাহিয়া দেখ, প্রভাত হইয়াছে—শ্রবণ কর, স্বজাতি-কুঞ্জের গৌরব-শাখীতে ভর করিয়া কর্ত্তব্য কোকিল, উৎসাহ শুক, আর উত্তেজনা শারী জয়জয়ন্তী তানে গান করিতেছে—নববঙ্গের নবোত্তম কুসুমের যশঃসৌরভে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইতেছে—নবোদ্ভিন্ন সুশিক্ষারূপ সুপক্ষধারী সুপবিত্র-চেতা ছাত্রপুঞ্জ মধুকর-শ্রেণী রূপে গুঞ্জরব করিয়া কুঞ্জবনে আসিতেছে—আবার বৃক্ষের অন্তরালে দৃষ্টি কর,

"সৌভাগ্য অরুণ"

তরুণ বেশে অল্পে অল্পে উদয় হইতেছে! তাহার শোভা দেখাইবার জন্য তোমরা তোমাদের সকল ভ্রাতাকে একত্র কর; সেই অরুণের আশ্চর্য্য আলোক দেখিয়া পুলক পাইয়া এই ভারত-লোকবাসী সকলেই শব্দ করুক "জয় জয় জয়!" হিমাচলের পবিত্র গিরিগুহা হইতে প্রতিধ্বনি হউক "জয় জয় জয়!" আকাশে শব্দ হউক "জয় জয় জয়!"

"হিন্দুমেলার জয়!"

"হিন্দুমেলার জয়!"

"হিন্দুমেলার জয়!"

তৃতীয় অধ্যায়

পরবর্ত্তী কার্য্যকলাপ ঃ বারুইপুরের মেলা

আমরা জাতীয় মেলার পর পর ছয়টি অধিবেশনের কথা বলিয়াছি। ষষ্ঠ অধিবেশনের পর ইহার কার্য্যকলাপ বিশেষভাবে প্রসারলাভ করে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, জাতীয় মেলার আদর্শে বারুইপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও মেলা অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হয়। বারুইপুরে তৃতীয় বার্ষিক মেলা হয় ১২৭৮ সালের ফাল্গুন-সংক্রান্তি দিবসে। মূল মেলার উদ্যোক্তা-গণ ইহাতেও যোগদান করিয়াছিলেন। মনোমোহন বসু মহাশয় এই অধিবেশনে একটি আবেগপূর্ণ বক্তৃতা করেন। তাঁহার শ্রোতা পল্লীবাসী, সুতরাং পল্লীবাসীদের বোধগম্য করিয়া তিনি বক্তৃতা করিলেন। মেলার উদ্দেশ্য বিবৃত করিতে গিয়া তিনি বলেন ঃ

"এই মেলা রাধাকৃষ্ণের উৎসবের জন্য নয়; গঙ্গার উদ্দেশ্যেও নয়; পীরের মহিমাসূচকও নয়; এই মেলার উদ্দিষ্টা দেবী তন্ত্রোক্তা নন—পুরাণোক্তা নন! ইহার নাম 'উন্নতি'। উন্নতি দেবীকে প্রসন্না করিবার জন্যই—তাঁহার অর্চ্চনা করিবার জন্যই এই মেলা প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছে। শারদীয়া মহাদেবীর ন্যায় এই উন্নতি দেবীও দশভুজা। তাঁহারও দশ হস্তে দশবিধ অস্ত্র আছে;—প্রথম হস্তে কৃষি, দ্বিতীয় হস্তে উদ্যানতত্ত্ব, তৃতীয় হস্তে বাণিজ্য, চতুর্থে শিল্প, পঞ্চমে ব্যায়াম, ষষ্ঠে সাহিত্য, সপ্তমে প্রতি-যোগিতা, অষ্টমে সামাজিকতার জীর্ণ সংস্কার, নবমে স্বাবলম্বন এবং দশম হস্তে ঐক্য! "উদ্যম" নামক সিংহের পৃষ্ঠে আরূঢ়া হইয়া উন্নতি দেবী এই সব অস্ত্র বিশেষতঃ শেষোক্ত অস্ত্র দ্বারা দৈত্যপতি 'পরবশ্যতার' বক্ষস্থল বিদ্ধ করিতেছেন। দৈত্যরাজের সর্ব্বাঙ্গে রুধিরধারা, চক্ষু রক্তবর্ণ, দেহ

কম্পিত জরজর, পরাস্তপ্রায়, তথাপি কি আশ্চর্য্য হারিয়াও হারিতেছে না—মরিয়াও মরিতেছে না! দেখে আতঙ্ক হয়, ব্রহ্মার বর পাইয়া অমর হইয়া কি দুষ্ট দৈত্য ভারত পীড়নে অবতীর্ণ হইয়াছে? কিন্তু ভরসা আছে বরদান কালে কোনো গুপ্ত ছিদ্র না রাখিয়া দেবতারা অসুর ও রাক্ষসকে বর দান করেন না। আমাদের এই দুর্জ্জয় শত্রুদমনেরও অবশ্য কোনো গুপ্ত রন্ধ্র আছে, আমরা তাহার নিগূঢ় জানি না। সেই গুপ্ত ছিদ্র পাইবার প্রয়াসে—অমঙ্গলরূপী অসুর দলের পিতা, ভর্ত্তা ও অধিনায়ক সেই পরবশ্যতার দমন প্রয়াসেই উন্নতি দেবীর ঘটস্থাপন স্বরূপ এই মেলার অনুষ্ঠান!"

নেশন্যাল স্কুল বা জাতীয় বিদ্যালয়

জাতীয় মেলার প্রধান উদ্যোক্তা নবগোপাল মিত্র মহাশয় এযাবৎ বিভিন্ন ভাবে ব্যায়ামচর্চ্চা ও অন্যান্য বিদ্যাশিক্ষার আয়োজন করিতেছিলেন। কিন্তু ১৮৭২ সনের ১লা এপ্রিল হইতে এই সকল বিভিন্ন প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করিবার জন্য ১৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ ক্যালকাটা ট্রেনিং একাডেমি ভবনে একটি নেশন্যাল স্কুল স্থাপন করিলেন। সকালে ও বিকালে এখানে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা হয়। নিম্নের বিজ্ঞপ্তিটি হইতে প্রতিষ্ঠাকালে কি কি বিষয় শিক্ষা দানের ব্যবস্থা হয় জানা যাইবে:

NATIONAL SCHOOL

(For the cultivation of Arts, Music, and for Physical Training)

Opened from the 1st of April last at the premises of the Calcutta Training Academy, No. 13, Cornwallis Street.

Class	On what days of the week to be opened and when	Fee
Arts		
Drawing and Modelling	Monday and Wednesday from 8-30 to 10-30 a.m.	0 8 0
Music	Thursday and Saturday from 7-30 to 9 p.m.	1 0 0
Physical Education	Thursday and Saturday from 5 to 6-30 p.m.	0 8 0

Moral instructions will also be imparted.

National Press,
April, 1872.

For admission apply to
Nobogopal Mitter.*

এই বিজ্ঞপ্তি হইতে জানা যাইতেছে যে, প্রতিষ্ঠাকালে নেশন্যাল স্কুলে মাত্র চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত ও ব্যায়াম শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রতিষ্ঠার ছয় মাসের মধ্যেই ইঞ্জিনীয়ারিং ও সার্ভেয়িং এবং রসায়নবিদ্যা শিক্ষারও ব্যবস্থা হইল। আর্ট্‌স স্কুলের শ্যামাচরণ শ্রীমানী এবং স্কুল অফ ফিজিক্যাল সায়ান্সের রাজকৃষ্ণ মিত্র যথাক্রমে উক্ত বিষয়সমূহ শিখাইবার ভার গ্রহণ করিলেন। পাঠের সময় ও বেতনাদি নিম্নাংশ† হইতে জানা যায়:

Geometrical Drawing etc. etc.	Wednesday, Friday and Saturday from 8 to 9 a.m.	2 0 0
Chemistry	Tuesday and Thursday from $6\frac{1}{2}$ to $8\frac{1}{2}$ p.m.	1 0 0

শ্যামাচরণ শ্রীমানী ইঞ্জিনীয়ারিং ও সার্ভেয়িং (Geometrical Drawing) শিক্ষার গুরুত্ব প্রতিপাদন করিয়া এই শ্রেণী খুলিবার

* *The National Paper,* July 10, 1872.

† *Ibid,* September 4, 1872.

দিন ১লা আগষ্ট স্কুল গৃহে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহাতে তিনি বলেন :

"আগামী ইংরেজী মাস হইতে নেশন্যাল স্কুলে ঘোড়া চড়ার একটী নূতন শ্রেণী খোলা হইবেক। মাসিক বেতন ৫ পাঁচ টাকা।"—'মধ্যস্থ' ১৬ ভাদ্র, ১২৪৮, অতিরিক্ত সংখ্যা।

নেশন্যাল স্কুলে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও অশ্বারোহণ শিক্ষারও ক্রমে ব্যবস্থা হয়। পরবর্ত্তী অক্টোবর হইতে অশ্বারোহণ শিক্ষাদান সম্বন্ধে এইরূপ জানা যাইতেছে :

The study of Geometrical drawing gives one the power to delineate, by plans, elevations, and sections, the length, breadth and height, or in other words the magnitude and make of any object, where a house, a machine, a bridge, a boat or a fort, and as all such delineations could be made by the same rules, and the same principles, a knowledge of this branch of Art is of equal importance to the Architect, the Mechanist, the Engineer (I should also mention the would-be Indian C.S.) and in fact to all classes of mechanical workmen, such as carpenters, bricklayers, blacksmiths, etc., etc.

সে-যুগের বহু ছাত্র এই নেশন্যাল স্কুলেও সকালে বিকালে যোগদান করিয়া বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পারদর্শী হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে ইঁহারা অনেকে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতা ব্যায়ামবীর জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিখ্যাত বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস প্রভৃতি নবগোপালের নেশন্যাল স্কুলে ব্যায়াম শিক্ষা করিতেন। নেশন্যাল স্কুলের পূর্ব্বেই নবগোপাল সম্ভবতঃ অশ্বারোহণ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কারণ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিতেছেন :

"তিনি একটা অশ্বশালা খুলেছিলেন, তাকে সবাই বলত নবগোপালের Circus, তাতে আমরা কেউ কেউ ঘোড়ায় চড়া শিখতে যেতুম।"

—"আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস", পৃ. ৩৯।

নেশন্যাল সোসাইটি বা জাতীয় সভা

নেশন্যাল সোসাইটি বা জাতীয় সভা জাতীয় মেলার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। জাতীয় মেলা সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠান। জাতীয় মেলার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া স্বদেশের উন্নতিমূলক বিভিন্ন বিষয়ে সম্বৎসর ধরিয়া কার্য্য ও আলাপ-আলোচনার জন্য জাতীয় সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। নিম্নের উদ্ধৃতিতে জাতীয় সভার উদ্দেশ্য এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে :

"জাতীয় সভা। হিন্দু মেলার স্বাক্ষরকারীগণ কর্ত্তৃক এই সভা প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছে। হিন্দু জাতির সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে জাতীয় ভাবের বর্দ্ধন এবং তাঁহাদিগের স্বাবলম্বিত যত্ন দ্বারা বিবিধ উন্নতি সাধন করাই এই সভার মূল উদ্দেশ্য। অন্যূন এক মুদ্রা বার্ষিক দান করিলেই হিন্দুনামধারী মাত্রেই এই সভার সভ্যতা পদের অধিকারী হইবেন।

"সভা দ্বারা 'হিন্দু মেলা' নামা একটী বার্ষিক মেলা অনুষ্ঠিত হয়; তাহাতে সর্ব্ব-সাম্প্রদায়িক হিন্দু সমবেত হইয়া স্বজাতীয় সর্ব্বপ্রকার উন্নতি পক্ষে উৎসাহদান ও উপায়াবলম্বন করা হইয়া থাকে। আর প্রতি মাসে একটী করিয়া সভার অধিবেশন হইয়া সভ্যগণ কর্ত্তৃক স্বজাতীয় হিতকর বিষয়াদি আলোচিত এবং দেশীয় পুরাকালিক শাস্ত্রাদি গ্রন্থের অন্তঃসারত্ব প্রদর্শিত হয়। নির্ব্বাচিত বিষয়ের মধ্যে কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান ও শারীরিক স্বাস্থ্যবিধায়ক শিক্ষা প্রভৃতির উন্নতি দিকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইবে। শাস্ত্রানুসারে ও সভার অন্যান্য উদ্দেশ্য সাধনার্থ যে কয়টী কার্য্যনির্ব্বাহক অধ্যক্ষ সভার প্রয়োজন হইবেক, তন্নিয়োগেরও কল্পনা আছে।

"উক্ত উদ্দেশ্য সমূহের সংসাধনকল্পে যে সকল শিক্ষালয় অনুষ্ঠিত হয়, সাধ্যানুসারে তত্তাবতের প্রতি উৎসাহদান ও আনুকূল্য করাও এই সভার অভিপ্রায়।

"জাতীয় সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকাদি সহযোগে স্বজাতীয় শুভকর বিষয়াদির সম্যগ আন্দোলন করিতেও সভা ত্রুটি করিবেন না।

"সভার বিশেষ প্রত্যাশা, সমস্ত হিন্দু মহাশয়েরা সভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া এই স্বজাতীয় অনুষ্ঠানের স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গীন সহায়তা করেন। সভার সম্পাদক বা সহকারী-সম্পাদককে পত্রদ্বারা সভ্য হওনের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেই হইতে পারিবেক।"

জাতীয় সভার এই অনুষ্ঠানপত্রখানি ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৭৯ সংখ্যক 'মধ্যস্থে' প্রকাশিত হয়। 'নেশন্যাল' বা জাতীয় কথাটি এই সভার সঙ্গে যুক্ত করায় কেহ কেহ ইহার এই বলিয়া সমালোচনা করেন যে, ইহা যদি হিন্দু সমাজের মধ্যেই নিবদ্ধ রহিল তাহা হইলে ইহার 'জাতীয়' নামের সার্থকতা কি? কেননা, ভারতবর্ষে হিন্দু ব্যতীত মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ই তো আছে। 'মধ্যস্থ' ও 'নেশন্যাল পেপার' উভয় পত্রিকাই প্রতিবাদের এই মর্ম্মে জবাব দেন যে, হিন্দুরা একটি স্বতন্ত্র জাতি এবং হিন্দু জাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিলনক্ষেত্রকে 'জাতীয়' নামে আখ্যাত করায় কোনই আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। 'নেশন্যাল পেপার' (৪ ডিসেম্বর, ১৭৭২) প্রতিবাদমূলক একখানি পত্র প্রকাশিত করিয়া নিজ মন্তব্যে লিখিলেন:

We do not understand why our correspondent takes exception to the Hindoos who certainly form a nation by themselves, and as such a society established by them can very properly be called a National Society.

অনুষ্ঠানপত্র প্রচারের এক মাসের মধ্যেই, ১৬ই পৌষের অধিবেশনে

জাতীয় সভায় এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হয় এবং ইহার কার্য্য সুপরিচালনার জন্য কয়েকটি কমিটি গঠিত হইয়া বিভিন্ন কার্য্যভার তাহাদের উপর অর্পিত হয়। গুরুত্ব বিবেচনায় এই সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 'মধ্যস্থ' (২২ পৌষ, ১২৭৯) হইতে এখানে উদ্ধৃত হইল :

"জাতীয় সভা। গত রবিবার সন্ধ্যার পর 'জাতীয় নাট্যশালা' বাটীতে* জাতীয় সভার এক প্রকাশ্য অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাহাতে কৃতবিদ্য ও বিখ্যাতনামা অনেক মহাশয় সভাসনে ও দর্শক শ্রেণীতে উপস্থিত ছিলেন। মহামান্য রাজশ্রীকালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর প্রধান আসন গ্রহণপূর্ব্বক রীতিমত সভার কার্য্যারম্ভ করিলে বাবু মনোমোহন বসু এই সভা সংস্থাপনের মূলাভিপ্রায়, তদ্দ্বারা ক্রমশঃ হিন্দু সমাজের মধ্যে জাতিভাব প্রবর্ত্তন ও ঐক্যবন্ধন দৃঢ়ীকরণ কিরূপে হইতে পারিবে তদ্বিষয় এবং কোনো কোনো স্থলে এই সভার 'জাতীয়' বিশেষণে যে আপত্তি উত্থাপন হইয়াছিল, তাহার প্রতিবাদসূচক অভিপ্রায় ব্যক্তকরতঃ সভার অনুষ্ঠাতাগণের অভিমতানুরূপ এই প্রস্তাব করিলেন যে, এই সভার কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহার্থ ও সুব্যবস্থা সাধন উদ্দেশ্যে পূর্ব্বকার মেলা সম্বন্ধীয় সাধারণ অধ্যক্ষ সভা ব্যতীত বিশেষ কার্য্যকরী একটি বিশেষ অধ্যক্ষ সভা নিযুক্ত হউক। তাহা পঞ্চমাংশে বিভাজিত থাকিবেক।

"সভার স্থান, সময়, সভাপতি, প্রবন্ধ লেখক ও প্রবন্ধের বিষয়াদি অবধারণ এবং পঠিত প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে যাহা কিছু কর্ত্তব্য, তত্তাবৎ প্রথম বিভাগের প্রধান কার্য্য হইবে।

"দ্বিতীয় ভাগ শিল্প ও বিজ্ঞান শাখায় নিযুক্ত থাকিবেন। অর্থাৎ সাধারণ শিল্প ও বৈজ্ঞানিক বিষয়ে উৎসাহদান ব্যতীত মেলাস্থলে যাহাতে

---

* "চিৎপুর রোডে গবর্ণমেণ্ট নর্ম্যাল স্কুলের সম্মুখে বাবু মধুসূদন সান্যাল মহাশয়ের বাটী"......'মধ্যস্থ', ১৫ পৌষ, ১২৭৯।

স্বদেশীয় হস্তসম্ভূত নানাপ্রকার শিল্প পদার্থ প্রদর্শিত ও সেই বিদ্যা সম্বর্দ্ধিত হয়, তৎপক্ষে বিশেষ মনোযোগী রহিবেন।

"ব্যায়াম-শিক্ষা-পদ্ধতির উন্নতি দিগে তৃতীয় বিভাগ, কৃষি ও উদ্যানতত্ত্ব সম্বন্ধে চতুর্থ এবং সঙ্গীত কল্পে পঞ্চম বিভাগ নিযুক্ত থাকিবেন।

"যে যে মহাশয়েরা যে যে বিভাগে অধ্যক্ষরূপে মনোনীত হইবেন, তাঁহাদিগের নামও প্রস্তাবিত হইল। বিশেষ অধ্যক্ষ সভা ও সাধারণ অধ্যক্ষ সভার অধিবেশন কাল ও কর্ত্তব্য কর্ম্মের নিয়ম কয়েকটির পাণ্ডু-লিপিও ঐ প্রস্তাবের সঙ্গে তিনি অর্পণ করিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পোষকতায় তত্তাবৎ সর্ব্ববাদীসম্মত গ্রাহ্য হইল।"

প্রতি মাসেই জাতীয় সভার অধিবেশন হইত এবং সভার ঘরোয়া কার্য্য ব্যতিরেকে বিভিন্ন বিষয়ে সমাজোন্নতিমূলক প্রবন্ধাদি পঠিত হইত। সভার কোন কার্য্যবিবরণী বা সমসাময়িক পত্রিকাদি ধারাবাহিক ভাবে হস্তগত না হওয়ায় ইহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রদান সম্ভব নয়। তবে উপরের উদ্ধৃতি হইতে জানা যাইতেছে যে, ১৮৭২ সালে জাতীয় সভা পুনর্গঠিত হইয়া ইহার কার্য্য রীতিমত চলিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। এই বৎসরের কাগজপত্র কিছু কিছু হস্তগত হওয়ায় জাতীয় সভার অধিবেশনগুলির অন্ততঃ কয়েকটি বিবরণ জানা সম্ভব হইয়াছে। জাতীয় সভা উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছিল। 'মধ্যস্থ'(২৩ ভাদ্র, ১২৭৯) ইহার সম্বন্ধে সাধারণভাবে লেখেন:

"বিখ্যাতনামা শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্র এবং তদীয় সুযোগ্য ভ্রাতৃবর শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীচরণ মিত্র প্রভৃতি মহাশয়ের বিবিধ যত্নে এই সভা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। বঙ্গীয় সমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তি প্রধান প্রধান আসন গ্রহণ ও সদ্বক্তা মহাশয়গণ উত্তম উত্তম বিষয়ের বক্তৃতা দ্বারা সর্ব্বমনোরঞ্জন করিতেছেন।"

এ বৎসর জাতীয় সভার দ্বিতীয় অধিবেশন হয় ১৪ই জুলাই তারিখে। ব্যবস্থা-দর্পণ-প্রণেতা শ্যামাচরণ সরকার 'হিন্দু আইন' সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। 'মধ্যস্থ' (৬ শ্রাবণ ১২৭৯) লেখেন :

"গত ১৪ই জুলাই রবিবার নেসন্যাল সোসাইটীর দ্বিতীয় অধিবেশন বাবু শ্যামাচরণ সরকার 'হিন্দু-লা' অর্থাৎ 'হিন্দুবিধি' বিষয়ে প্রায় দেড়-ঘণ্টাকাল এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাঁহার বক্তৃতা অতি উত্তম হইয়াছিল। নবগোপালবাবুর যত্নে এই সভা দন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে।"

জাতীয় সভার তৃতীয় অধিবেশন হয় পরবর্ত্তী ১১ই আগষ্ট। জন বীম্‌স নামক সিভিলিয়ান কর্ম্মচারী ফ্রান্সের ফ্রেঞ্চ একাডেমীর আদর্শে বাংলা ভাষা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি পরিষদ স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এবারে রাজনাবায়ণ বসু মহাশয় এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া বাংলা ভাষার উপরে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। 'মধ্যস্থ' (২ ভাদ্র, ১২৭৯) ইহার বিবরণ এইরূপ দিয়াছেন :

"বিগত ১১ই আগষ্ট রবিবার সার্দ্ধ চারি ঘণ্টার সময় কলিকাতা ট্রেনিং একাডেমী বিদ্যালয়গৃহে নেশন্যাল সোসাইটীর তৃতীয় অধিবেশন হইয়াছিল। পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বঙ্গভাষার বিখ্যাত লেখক রাজনারায়ণ বসু বীম্‌স সাহেবের প্রস্তাবিত 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ভাষা ও রীতি-সংস্থাপনী সভা' এই প্রসঙ্গোপরি প্রায় তিন ঘণ্টাকাল এক সুদীর্ঘ মৌলিক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গভাষার উৎপত্তি, ইতিহাস, উন্নতি প্রভৃতি সুদীর্ঘরূপে বিবৃত করিয়া পরিশেষে প্রকৃত প্রস্তাব আরব্ধ করেন। তাঁহার বক্তৃতা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। পরে কিয়ৎক্ষণ তর্কবিতর্কের পর সভাপতি মহাশয় এই প্রস্তাব করেন যে সভা কর্ত্তৃক বীম্‌স সাহেবকে

ধন্যবাদ দিয়া এই মর্ম্মে এক পত্র লেখা হয় যে তাঁহার মতের সাহিত্য-রীতি সংস্থাপনী সভা না হইয়া একটি সমালোচনী সভা হইলে ভাল হয়। এই প্রস্তাব সভ্যগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে রাত্রি ৮॥০ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।"

এই বক্তৃতার কথা আত্ম-চরিতেও রাজনারায়ণ বসু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (পৃ. ১৯২-৩)।

জাতীয় সভার চতুর্থ অধিবেশন হয় পূর্ব্ববর্ত্তী স্থানে ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে। এবারকার বক্তাও রাজনারায়ণ বসু মহাশয়। তিনি 'হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' শীর্ষক এক যুগান্তকারী বক্তৃতা প্রদান করিলেন। সভার সভাপতি হইয়াছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই বক্তৃতা লইয়া এ দেশে ও বিদেশে, সপক্ষে ও বিপক্ষে নানারূপ আলোচনা হয়। বঙ্গের উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ এবং খ্রীষ্টানগণ বিভিন্ন সভা-সমিতিতে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজনারায়ণের উক্তির সারবত্তা তাঁহার প্রতিবাদীরাও অনেকে পরে স্বীকার করিতে বাধ্য হন। বসু মহাশয় আত্ম-চরিতে এই বক্তৃতা ও ইহা হইতে উদ্ভূত আন্দোলন সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দিয়াছেন (পৃ. ৮৬-৯২)।

শারদীয়া পূজার জন্য জাতীয় সভার পঞ্চম অধিবেশন এক সপ্তাহ পূর্ব্বেই ২রা অক্টোবর (১৭ই আশ্বিন) দিবসে অনুষ্ঠিত হয়। রাজা কালী-কৃষ্ণ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। জাতীয় মেলার অন্যতম উৎসাহী কর্ম্মী 'মধ্যস্থ' সম্পাদক মনোমোহন বসু মহাশয় 'হিন্দু আচার ব্যবহার—সামাজিক ও পারিবারিক' প্রবন্ধের প্রথম অংশ এখানে পাঠ করেন; ইহার দ্বিতীয় অংশ পরবর্ত্তী জাতীয় মেলায় পঠিত হয়। দুইটি অংশই পর পর পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

জাতীয় মেলার ষষ্ঠ অধিবেশন হইল ১৭ই নবেম্বর। এবারে বিজ্ঞবর

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রের বিষয়ে বক্তৃতা করেন। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (২১ নবেম্বর ১৮৭২) বক্তৃতা সম্বন্ধে লেখেন :

"গত রবিবারে জাতীয় সভায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যোগশাস্ত্র সম্বন্ধীয় একটি বক্তৃতা পাঠ করেন। আমরা বক্তৃতাটি শুনিতে যাই।...দ্বিজেন্দ্রবাবু বক্তৃতায় অসাধারণ বুদ্ধি ও বিদ্যার পরিচয় দেন।..."

জাতীয় সভার সপ্তম অধিবেশন হয় ২৯শে ডিসেম্বর। এবারে নীলকমল মুখোপাধ্যায় 'জমীদার ও রাইয়ত' শীর্ষক বক্তৃতা পাঠ করেন। এবারকার অধিবেশনের কথা বিজ্ঞাপিত করিয়া 'মধ্যস্থ'। (১৫ পৌষ ১২৭৯) লিখিলেন :

"আগামীকল্য রবিবার রাত্রি ৭॥০টার সময় জাতীয় সভার এক অধিবেশন হইবেক। যে বাটীতে জাতীয় নাট্যশালা সেই বাটীতেই অর্থাৎ চিৎপুর রোডে গবর্ণমেণ্ট নর্ম্যাল স্কুলের সম্মুখে বাবু মধুসূদন সান্যাল মহাশয়ের বাটীতেই হইবেক।...একস্থানেই জাতীয় রঙ্গভূমি ও জাতীয় সভা প্রতিষ্ঠিত হইল।"

অতঃপর জাতীয় নাট্যশালা গৃহেই কিছুকাল যাবৎ জাতীয় সভার অধিবেশন হইতে থাকে। এখানে প্রদত্ত নীলকমল বাবুর বক্তৃতা লইয়া পত্রিকাদিতে আন্দোলন উপস্থিত হয়। সভার অষ্টম অধিবেশন রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের সভাপতিত্বে সুসম্পন্ন হয়। বক্তা—উড়িষ্যাবাসী পণ্ডিত হরিহর দাস (শর্ম্মা), বক্তৃতার বিষয়—ন্যায় কুসুমাঞ্জলি। বক্তৃতা আংশিক লিখিত ও আংশিক মৌখিক প্রদত্ত হয়। ইহা সংস্কৃত ভাষায় ব্যক্ত হইয়া বাংলাতেও সমুদয় বিবৃত হয়। 'মধ্যস্থ' (২০ মাঘ ১২৭৯) বক্তাকে অভিনন্দন জানাইয়া লিখিয়াছিলেন :

"জাতীয় সভাতে বঙ্গীয় সভ্য ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য খণ্ডের হিন্দুগণ আসিয়া যত যোগ দিবেন, ততই 'জাতীয়' বিশেষণের সার্থকতা

হইবে। পণ্ডিত হরিহর দাস উড়িষ্যাবাসী, তিনি এই সভায় বক্তৃতা করাতে সেই আশা সিদ্ধি, সুতরাং হর্ষবৃদ্ধি হইতেছে। এই অষ্টম অধিবেশনের সমুদয় কার্য্য বিশেষ আনন্দ সহকারে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।"

জাতীয় সভার এই অধিবেশনেই পরবর্ত্তী জাতীয় মেলার তাবদ্বিষয়ে ব্যবস্থা বিধানের ভার কয়েক জন সভ্যের উপর অর্পিত হয়। তাঁহারা যথাক্রমে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক সম্পাদকদ্বয়, নবগোপাল মিত্র সহকারী সম্পাদক, রাজনারায়ণ বসু, সীতানাথ ঘোষ এবং মনোমোহন বসু। 'মধ্যস্থ' কিন্তু লিখিলেন, "বস্তুতঃ যিনি যাহা করুন, কিন্তু গুণাকর সহকারী সম্পাদকের স্কন্ধেই পর্ব্বত।"

সপ্তম অধিবেশন, ১৮৭৩

জাতীয় মেলার আয়োজন যথারীতি আরম্ভ হইল। ১৫ই, ১৬ই ও ১৭ই ফেব্রুয়ারী অধিবেশনের দিন ধার্য্য হইল। এবারে অধিবেশন হইল হীরালাল শীলের নৈনানস্থ বাগানে। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' আসন্ন অধিবেশন সম্পর্কে লিখিলেন :

"জাতীয় মেলা। ফাল্গুন মাসের এই তারিখে জাতীয় মেলার সমাবেশ হইবে।...স্রোতের গতি ফিরিয়াছে, এখন হিন্দু সমাজ কিসে রক্ষা পায়, তাহার প্রতি অনেকে কায়মনোবাক্যে যত্ন করিতেছেন। বাবু রাজনারায়ণ বসু হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক প্রস্তাব যখন পাঠ করেন, তখন শ্রোতৃবর্গের কত যে উৎসাহ হয়, তাহা বলা যায় না।...

"বাবু নবগোপাল মিত্র কলিকাতায় অনেকগুলি ব্যায়াম চর্চ্চার নিমিত্ত স্কুল খুলিয়াছেন এখন তাঁহার এই মাত্র যত্ন যে, ইহার কিসে শ্রীবৃদ্ধি হয়। ক্যাম্বেল সাহেব আর যত অনিষ্ট করুন, তিনি আমাদিগকে

শিশিরকুমার ঘোষ

রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর

৺

শারীরিক ব্যায়াম চর্চ্চা শিক্ষায় উৎসাহ দিয়া বিশেষ উপকার করিতেছেন।...

অধিবেশন আরম্ভ হইল। প্রথম দিন মেলার চাঁদাদাতৃবর্গ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের লইয়া মেলা-ক্ষেত্রে সভা হইল। ইহার পৌরোহিত্য করেন রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর। তাঁহার প্রারম্ভিক অভিভাষণের পর অন্যতর সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় গত বৎসরের কার্য্যকলাপ সম্পৃক্ত একটি বিবরণ পাঠ করেন। তিনি ইহাতে জাতীয় মেলা এবং জাতীয় সভার উদ্দেশ্য ও কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন। হিন্দুজাতির পূর্ব্বগৌরব ও বর্ত্তমান হীন অবস্থার তুলনামূলক আলোচনা পূর্ব্বক তিনি জাতীয় উন্নতি-বিধান কল্পে সকলকে অবহিত হইতে অনুরোধ করিয়া বিবরণ শেষ করিলেন। মেলা উপলক্ষে রচিত কয়েকটি স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক সঙ্গীত বাদ্যাদি সহযোগে গীত হইবার পর এদিনকার মত সভা ভঙ্গ হয়।

রবিবারই মেলার প্রধান উৎসবের দিন। বেলা এগারটার সময় রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের পৌরোহিত্যে সাধারণ অধিবেশন আরম্ভ হইল। সম্পাদক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে পর সভাপতির আহ্বানে মনোমোহন বসু মহাশয় "হিন্দু আচার ব্যবহার—সামাজিক" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। ইহার প্রথম অংশ তিনি ইতিপূর্ব্বে জাতীয় সভায় পাঠ করিয়াছিলেন বলিয়াছি। বক্তৃতার পরে আবার সঙ্গীত হয়।

বক্তৃতাগৃহের পার্শ্বেই বিভিন্ন তাঁবুতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত এবারেও দেশজ শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছিল। প্রদর্শনী ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের কৃত বিবিধ সূচীকর্ম্ম, আলোকচিত্র, শারীর চর্চ্চার ও লাঠিখেলার নানা সাজসরঞ্জম, ভাস্কর্য্যে দ্রুপদের রাজসভা, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক লক্ষ্যভেদ ও দ্রৌপদী লাভ, ডেঙ্গু জ্বরাক্রান্ত রোগী, দেশীয় চারুশিল্পীদের দ্বারা অঙ্কিত শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা, মাতা যশোদার ক্রোড়ে শ্রীকৃষ্ণ, মূর্ত্তিতে শিব কর্ত্তৃক সতীর শব-বহন প্রভৃতি বিভিন্ন তাঁবুতে সাজাইয়া রাখায়

দর্শকদের বিশেষ নয়নাভিরাম হইয়াছিল। বিবিধ ফুল, ফল ও শাকসবজীও প্রদর্শিত হয়। রমানাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে উৎকৃষ্ট মালীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নীলকমল মুখোপাধ্যায় বিচারক ছিলেন।

এবারকার পুস্তক-প্রদর্শনীটি বড়ই উত্তম হইয়াছিল। কবিতা, ইতিহাস, উপন্যাস, সাধারণ সাহিত্য, বিজ্ঞান, অভিধান প্রভৃতি বিষয়ক সংস্কৃত বাংলা বহু পুস্তক গ্রন্থকারগণ প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

ব্যায়াম কুস্তি কসরতাদিরও বিশেষ ব্যবস্থা হয়। এবারে কুস্তি-দর্শনেচ্ছু ব্যক্তিদের জন্য দর্শনী গ্রহণ করা হইয়াছিল। সুখের বিষয়, বহুলোক দর্শনী দিয়া কুস্তিক্ষেত্রে গমন করে, কিন্তু জনতা অকস্মাৎ গণ্ডগোল সৃষ্টি করায় এদিন কুস্তি কসরৎ দেখান হয় নাই। তবে লাঠিয়ালগণ তাহাদের লাঠিখেলা দেখাইতে সমর্থ হয়। পরের দিন ব্যায়াম কুস্তি লাঠিখেলা প্রদর্শিত হয় এবং তাহাদের কৃতিত্বে সকলেই সাধুবাদ করেন। জনৈক যুবক আগুনের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া গিয়াছিল!

মেলায় জাতীয় নাট্যশালার অভিনেতৃগণ 'ভারত-মাতার বিলাপ' নাটকের অভিনয় করেন। অভিনয় কিরূপ মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল পশ্চাৎ-উদ্ধৃত 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র বিবরণ পাঠে তাহা জানা যাইবে।

মেলার তৃতীয় দিনে সভাপতিত্ব করেন রাজনারায়ণ বসু মহাশয়। এখানে সীতানাথ ঘোষ "বঙ্গের সংক্রামক জ্বরের কারণ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ব্যায়াম কসরৎ লাঠিখেলার পর জাতীয় সঙ্গীত গীত হইলে মেলার কার্য্য শেষ হয়।

১৯ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি (১৮৭৩) সংখ্যা 'নেশন্যাল পেপার' হইতে মেলার বিবরণের মর্ম্ম সংক্ষিপ্তাকারে প্রদত্ত হইল। মেলার কৃতিত্ব ও ভাবী সাফল্য সম্পর্কে উক্ত পত্রিকার মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য :

The mela has completed its seventh year. If a greater measure of public sympathy be accorded to it

[it] may grow to more useful purpose and in a certain sense, a Representative Institution. It may ultimately become a power in the nation, an innocent annual gathering of the people—the occasion of our rejoicing, a loving examination of the nation's advance in art and science, and an appreciation of treasures bequeathed to us by our ancestors. Let us hope that the Mela will be a binding power endearing the Hindu name to the Aryan people wherever scattered through India."

'অমৃতবাজার পত্রিকা' জাতীয় মেলার গুণগ্রাহী ও পৃষ্ঠপোষক। ইহার শ্রীবৃদ্ধিকল্পে পত্রিকার পরামর্শ উপদেশ সমালোচনা কোনমতেই অগ্রাহ্য করিবার নয়। পত্রিকার উপদেশ কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রহণ করিয়া মেলা-কর্ত্তৃপক্ষ ইহার বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। সপ্তম অধিবেশন সম্পর্কেও পত্রিকার মন্তব্য এবং পরামর্শ প্রণিধানযোগ্য। শহর হইতে মফস্বলে যাহাতে জাতীয় ভাব ছড়াইয়া পড়ে এজন্য তাঁহার বড়ই আগ্রহ। পত্রিকা লেখেন :

"মেলা আজ কয়েক বৎসর অপ্রতিহত ভাবে হইল। এখন আমাদের কতক কতক ভরসা হয় যে এটি বুঝি স্থায়ী হইয়াছে, ···। প্রথম বৎসর মেলায় ঘোড়দৌড় প্রভৃতি অনেকগুলি পৌরুষিক কাজ হয়, সেবার এদেশীয় একজন ধনাঢ্য একটি ভারি বজ্জাত ঘোড়া চালাইতে বিপদাপন্ন হন, ও আমরা ইহা দেখিয়া বড়ই পুলকিত হই। ৬ বৎসর যখন উহা জীবিত আছে, উহার প্রণেতার উৎসাহ যখন সমানভাবে আছে, যখন শত শত লোক রৌদ্র ধূলা দূরত্ব কিছুই মনে না করিয়া মেলায় উপস্থিত হয়, তখন উহা দ্বারা যে কিছু উপকার হইয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই। ···মেলার কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের উদ্দেশ্য মহৎ। তাহারা যেমন লোক সংগ্রহ করিতে চান, সেইরূপ সঙ্গে সঙ্গে দেশের মঙ্গল সম্পাদন করিতে চান। আমাদেরও এই

মত,…ব্যায়াম চর্চ্চাটি অতি উত্তমের বিষয়...যদি কাজে লাগিবে এই উদ্দেশ্যে লাঠি, তলোয়ার, বন্দুক, তীর প্রভৃতি শিক্ষা করে তবে বড় ভাল হয়।… নবগোপালবাবু একা, তিনি ধন প্রাণ সমুদায় মেলার নিমিত্ত বিসর্জ্জন করিয়াছেন, সুতরাং তাহার নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ আছি। তিনি যদি মেলার নিমিত্ত বৎসরে দুই মাস মফঃস্বলে পর্য্যটন করেন তবে তিনি দেখিবেন যে তিনি মেলার অনুষ্ঠান করিয়া অকূলপাথারে ঝম্প প্রদান করেন নাই। … দেশের মধ্যে আপাতত রাজনৈতিক সম্বন্ধে লোকের স্বার্থ ক্রমেই উদ্দীপ্ত হইয়াছে এবং যদি কোথায় কোন অত্যাচার হইতেছে মেলা দ্বারা নবগোপালবাবু তাহার সংগ্রহ করেন তবে বিস্তর উপকার হইতে পারে। তিনি যদি বারওয়ারীর সং কি দেবদেবীর উপাসনার অনুষ্ঠান না চান, তবে এক কাজ করিতে পারেন। তিনি পুতুল দ্বারা দেশের সামাজিক ও রাজ-নৈতিক অনেক দুর্দ্দশা প্রাঞ্জলরূপে প্রকাশ করিতে পারেন।…এবার হিন্দু মেলাতে নেশন্যাল থিয়েটর যখন "ভারতমাতার বিলাপ" অভিনয় করিলেন, তখন শ্রোতৃবর্গমাত্র অশ্রুপতন করেন।…আমরা নবগোপালবাবুকে এক পরামর্শ দেই। তিনি এবার মফস্বল গমন করিয়া যাহাতে মফস্বলবাসীরা এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়, তাহার যত্ন করুন।"

চতুর্থ অধ্যায়

জাতীয় সভার কার্য্যক্রম

জাতীয় মেলার সপ্তম অধিবেশনের পর হইতে নেশন্যাল সোসাইটি বা জাতীয় সভার কার্য্য আরও ব্যাপক হইয়া পড়িল। ইহার কার্য্যক্রম শুধু প্রবন্ধ পাঠ বা বক্তৃতা দানের মধ্যেই নিবদ্ধ রহিল না, সমাজহিতকর নানা বিষয়েও ইহা হস্তক্ষেপ করিল। জাতীয় মেলার অধিবেশনের পর জাতীয় সভার অধিবেশন হয় ১৮৭৩, ২৩শে মার্চ্চ (১১ চৈত্র ১২৭৯) দিবসে। রাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর সভার পৌরোহিত্য করেন। 'মধ্যস্থ' (১৭ চৈত্র, ১২৭৯) বলেন :

"এই সভা ক্রমেই বর্দ্ধিতা হইয়া হিন্দুসমাজের সর্ব্বশ্রেণীর একটি মহা-মঙ্গলময় সমাবেশভূমি হইয়া উঠিতেছে। গত রবিবারের প্রকাশ্য অধিবেশন সম্ভ্রান্ত ও বিদ্বান জনগণের জনতায় পূর্ণ এবং বিবিধ প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনায় সর্ব্বলোকের চিত্তহর হইয়াছিল। প্রসিদ্ধনামা স্বর্গগত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের দৌহিত্র বাবু ভূজেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বীয় রম্য ভবনের দ্বিতীয় তলস্থ এক সুপ্রশস্ত ও সুসজ্জিত গৃহ এক বৎসরের নিমিত্ত সভার ব্যবহার জন্য অর্পণ করাতে সভাধিবেশনের বিশেষ সুবিধা এবং সভার কার্য্য সম্পাদকগণের সম্পূর্ণ আসান হইয়াছে। সভায় তিন শতাধিক মান্যগণ্য ব্যক্তি আগমন করিয়াছিলেন।"

একটু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সভার কার্য্যক্রম এই সময় হইতে ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছিল। এই সভায় মনোমোহন বসু প্রস্তাব করেন যে, "ব্যবস্থাপক সভায় সম্প্রতি আবগারী আইন সংশোধনের প্রস্তাব হইয়াছে, এই সময় দেশের সর্ব্ব স্থান হইতে সর্ব্বনাশক পান দোষের হ্রাসতাকারক উপায় অবলম্বন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে উত্তেজিত করা উচিত। অন্যান্য সভা এবিষয়ে

অগ্রসর হইয়াছেন। এক্ষণে জাতীয় সভা হইতে জাতীয় অভিপ্রায় গবর্ণমেণ্টে অর্পিত হওয়া উচিত। অতএব সভার সাহিত্য বিভাগের প্রতি এই কার্য্যের ভার এবং অপর যোগ্য ব্যক্তিগণকে তাঁহাদের দলভুক্ত করিয়া লইবার ক্ষমতা দেওয়া হউক।"

এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সীতানাথ ঘোষ বিগত মেলায় "সংক্রামক জ্বরের কারণ" শীর্ষক যে প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহার ভিতরে এমন অনেকগুলি গুরুতর বিষয় সন্নিবেশিত ছিল যাহা বিজ্ঞানবিৎ ইউরোপীয়দের এবং গবর্ণমেণ্টের গোচরে আনা কর্ত্তব্য। এজন্য সভার সহকারী সম্পাদক নবগোপাল মিত্রের প্রস্তাবে ইংরেজীতে উক্ত প্রবন্ধের সারমর্ম্ম সঙ্কলনের কথা হয়। ইহার পর রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার "সেকাল আর একাল" নামক বিখ্যাত বক্তৃতা পাঠ করেন।

'মধ্যস্থ' (৭ বৈশাখ ১২৮০) নববর্ষে পদার্পণ করিয়া পূর্ব্ব বৎসরের কার্য্যাবলীর একটি সালতামামি প্রকাশ করেন। তাহাতে 'জাতীয় সভা' সম্পর্কে তিনি লিখিলেন :

"সর্ব্বাপেক্ষা জাতীয় সভার অভ্যুদয় পরম মঙ্গলের কারণ হইয়াছে। তৎপ্রতিষ্ঠিতা মহাশয়েরা গত বর্ষে যেরূপ একাগ্রতা ও অনুরাগ দেখাইয়াছেন, তাহা যদি অবিচলিত থাকে এবং কার্য্যানুষ্ঠানের উপকরণ আরো যদি সুপ্রাপ্য হয়, তবে দেখিবেন অত্যল্পকাল মধ্যেই এই সভা দেশের মঙ্গলভূমি হইয়া উঠিবে—অধিকাংশ দেশহিতার্থী মহাশয়েরা ইহাতে সম্মিলিত হইয়া সভার মহোচ্চ নাম ও উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে পারিবেন। গত বর্ষে এই সভাদ্বারা যে একটি কাজ হইয়াছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে নবশিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্বপ্নের অগোচর ছিল। তাঁহাদের দৃষ্টিতে হিন্দু-ধর্ম্ম-কর্ম্ম গলিত বস্তু মধ্যেই গণ্য হইত, ১২৭৯ বঙ্গাব্দে সেই দুইটি বস্তুর অভ্যন্তরে চমৎকার সার প্রদর্শিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে সেই অভ্যন্তর ভাগের অন্তস্তলে আরো অপূর্ব্ব রত্নসমূহ দৃষ্ট হইবে, এমত ভরসা হইতেছে!"

১৮৭৩ সালের এপ্রিলের প্রথমে কলিকাতা হাইকোর্ট ব্যভিচারিণী হিন্দু বিধবার পক্ষে স্বামীর বিষয়াধিকারের অনুকূলে একটি রায় দেন। ইহার বিরুদ্ধে জাতীয় সভা তীব্র আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। ২০শে এপ্রিল রাজা কমলকৃষ্ণের সভাপতিত্বে জাতীয় সভার এক সাধারণ অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে প্রাণনাথ পণ্ডিত উক্ত রায়ের কুফল প্রদর্শনপূর্ব্বক শাস্ত্রবাক্য এবং এবিষয়ে অতীত ও তৎকালীন পণ্ডিতগণের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধপাঠের পর এ সম্বন্ধে মনোমোহন বসু, নবগোপাল মিত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু এবং হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা করিলেন। রাজনারায়ণ বসু বলেন, 'ইউরোপে স্ত্রীপ্রভুত্ব যেমন সমাজের ভিত্তি, এদেশে সতীত্ব তেমনি আমাদের সমাজ-ভিত্তি! পুরুষের বীরত্ব জন্য তাঁহাদের যেমন, স্ত্রী-সতীত্ব জন্য আমাদের তেমনি বড়াই!" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি আবেগপূর্ণ বক্তৃতায় এই মর্ম্মে বলিলেন,'হিন্দুজাতির সমুদয় ভাল ভাল রীতিপদ্ধতিই গিয়াছে, মাত্র স্ত্রীর সতীত্বটিই অব্যাহত ছিল। তাহাও এখন যাইবার উপক্রম হইয়াছে।' হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে বিলাতে আপীল এবং এদেশে ব্যাপক আন্দোলন উপস্থিত করিবার জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সভায় গৃহীত হইল :

"১। ঐ নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আদালতে আপীল করা কর্ত্তব্য।

"২। তজ্জন্য ছয় মাস মাত্র মেয়াদ আছে, তন্মধ্যে অর্দ্ধমাস বিগত হইয়াছে। অতএব অতি সত্বর সকল উদ্যোগ করিতে হইবে।

"৩। ইহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যে কতিপয় সহস্র টাকার প্রয়োজন, তাহা সাধারণ হিন্দুসমাজ হইতে চান্দা দ্বারা সংগ্রহ করিতে হইবে। সুধু যেন সমর্থ ব্যক্তিগণের নিকটেই দান চাওয়া না হয়, ব্যবসায়ী, চা'কুরে, জমীদার প্রভৃতি ধনীনির্ধনী সকলের নিকট হইতেই যাহার যেমন সাধ্য (চারি কি এক আনা পর্য্যন্ত) আনুকূল্য গৃহীত এবং এই সভাস্থলেই তাহার সূত্রপাত আরম্ভ হউক।

"৪। এই সমস্ত বিষয় নির্ব্বাহ নিমিত্ত এক বিশেষ অধ্যক্ষ সভা নিযুক্ত হইল। তাহাতে অদ্যতনীয় সভাপতি মহাশয় সভাপতি এবং বাবু প্রাণনাথ পণ্ডিত ও বাবু নবগোপাল মিত্র মহাশয়দ্বয় সম্পাদক এবং উকীল, জমীদার, পত্রসম্পাদক ও অন্যান্য অনেক শ্রেণীর মহাশয়েরা সভ্যরূপে মনোনীত হইলেন।

"৫। অধ্যক্ষসভার প্রতি অনুরোধ রহিল, তাঁহারা যেন সনাতন ধর্ম্ম-রক্ষিণী প্রভৃতি সভা সমূহকে এই সভার কার্য্যবিবরণ ও প্রস্তাবাদি প্রেরণ পূর্ব্বক সাধারণ হিন্দু সমাজকে একবাক্য করিতে প্রয়াস পান এবং নির্দ্দিষ্ট অধ্যক্ষগণ ব্যতীত তাঁহাদের মতে অপর যোগ্য ব্যক্তিগণের অধ্যক্ষ সমাজভুক্ত করিতে পারিবেন এমত ভার তাঁহাদের প্রতি অর্পিত হউক।"—'মধ্যস্থ' ১৪ বৈশাখ ১২৮০।

এ বিষয়ে শ্রোতাদের মধ্যে ভীষণ বিক্ষোভ উপস্থিত হইল। সভাক্ষেত্রেই প্রায় দেড় হাজার টাকা চাঁদার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। জাতীয় সভাকে কেন্দ্র করিয়া এই বিষয়ে আন্দোলন মফস্বলেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পরবর্ত্তী ১৩ই জ্যৈষ্ঠ (২৫শে মে, ১৮৭৩) এই সম্পর্কে পুনরায় জাতীয় সভার অধিবেশন হয়।—'মধ্যস্থ' ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৮০।

ইতিমধ্যে জাতীয় সভার কর্ম্মকর্ত্তাদের কিঞ্চিৎ রদবদল হইল। রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর স্থায়ী সভাপতি হইলেন, সহকারী সভাপতি হইলেন বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র এবং রাজনারায়ণ বসু। 'মধ্যস্থ' (৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১২৮০) লেখেন, "রাজাবাহাদুর ও রাজনারায়ণ বসু পূর্ব্ব হইতেই সভার প্রতি যথোচিত অনুরাগী ও বিশেষ হিতকারী ছিলেন। এক্ষণে দ্বারকানাথ বাবুর সংযোগে অবিকল মণিকাঞ্চন যোগ হইয়া উঠিল।"

জাতীয় সভায় বক্তৃতাও রীতিমত চলিতেছিল। ১৮৭৩, ২৪শে আগষ্ট অনুষ্ঠিত এক সভায় মনোমোহন বসু মহাশয় দেবালয় ও তীর্থস্থানসমূহ সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। সভায় পৌরোহিত্য করেন স্থায়ী সভাপতি

রাজা কমলকৃষ্ণ। এ সময় বিলাতে রাজস্ব কমিটিতে সাক্ষ্য দানের জন্য গবর্ণমেণ্ট কতিপয় প্রতিনিধি প্রেরণ করা সাব্যস্ত করেন। এ বিষয়ে সভায়—

"বাবু প্রাণনাথ পণ্ডিত 'রাজস্ব কমিটি'তে এ দেশীয় সাক্ষী সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি, দেশবাসীর মুখপাত্র নহেন। আলোচনায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবগোপাল মিত্র ও মনোমোহন বসু এতদ্বিষয়ের বিচারে লিপ্ত হইয়াছিলেন। মনোমোহন বলেন, যখন গবর্ণমেণ্টের মনোনীত সাক্ষীগণের মধ্যে প্রায় কাহারো পূর্ব্ব কার্য্য এমন দেখা যায় নাই, যে, তাঁহাকে প্রতিনিধি জ্ঞান করা যাইতে পারে, তখন সভা কর্ত্তৃক তাঁহাদের প্রতি কোন অনুরোধ করা হইলে এইটি বুঝাইবে যেন আমরা (দেশের লোক) তদ্রূপ প্রতিনিধিত্বে বরণ করিলাম ইত্যাদি।

অনেক বিতণ্ডার পর ধার্য্য হইল যে, এ বিষয়ে প্রাণনাথ পণ্ডিত একখানি স্বাভিপ্রায়লিপি লিখিয়া অধ্যক্ষগণকে দিবেন; তাঁহারা রাজনীতিজ্ঞ দেশীয় বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের অভিমত গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার মীমাংসা করতঃ সভায় অর্পণ করিবেন।"

"মহা-ব্যায়াম-প্রদর্শন"

জাতীয় মেলা ও জাতীয় সভার উদ্যোক্তাদের একটি বিশেষ কার্য্য ভারতবাসীদের মধ্যে ব্যায়াম চর্চ্চার প্রবর্ত্তন। জাতীয় উন্নতির পক্ষে যে এইটি একান্ত আবশ্যক তাহা তখনকার শিক্ষিত সমাজ একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিল। মেলার প্রধান উদ্যোক্তা নবগোপাল মিত্র মহাশয় বিশেষ ভাবে উক্ত বিষয় উপলব্ধি করিয়া মেলা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ব্যায়ামশালা প্রতিষ্ঠা করেন। জাতীয় বিদ্যালয়ে ও অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ব্যায়ামচর্চ্চা ক্রমে একটি বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় হইয়াছিল। ব্যায়ামবিদ্যা প্রবর্ত্তনে জাতীয়

মেলা ও জাতীয় সভার সহকারী সম্পাদক নবগোপাল মিত্রের কৃতিত্ব সম্বন্ধে 'মধ্যস্থ' (৭ই বৈশাখ, ১২৮০) লেখেন :

"স্বদেশহিতৈষী সহকারী সম্পাদক বাবু নবগোপাল মিত্র মহাশয়ই বঙ্গদেশে ব্যায়ামবিদ্যার প্রথম ও প্রধান প্রবর্ত্তক। তাঁহার অবিচলিত অধ্যবসায় বলেই কয়েক বৎসর মধ্যে ইহা এতদূর উন্নত হইয়া উঠিয়াছে, যে, লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর প্রভৃতি বড় বড় ইংরাজেরাও হিন্দু ছাত্রবৃন্দের অঙ্গচালনা-কৌশল দর্শনে মহা মহা তুষ্ট হইয়াছেন। অধিক কি জাতীয় ব্যায়মবিদ্যালয়ের একজন উত্তীর্ণ ছাত্র [শ্যামাচরণ ঘোষ] মেং ক্যাম্পবেল সাহেবের প্রতিষ্ঠিত দেশীয় সিবিল সার্ব্বিস শ্রেণীর ব্যায়াম শিক্ষকের পদলাভ করিয়াছেন।"

মৃজাপুর, শিমলা, শুঁড়িপাড়া, বেনিয়াটোলা, আহিরীটোলা প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যায়াম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে ব্যায়ামবিদ্যা প্রসারলাভ করে। জাতীয় সভার ব্যায়ামবিদ্যা বিভাগ রাজা রামমোহন রায়ের আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ ভবনে ব্যায়াম-বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রদের দ্বারা এক 'মহা-ব্যায়াম-প্রদর্শনে'র আয়োজন করেন। 'মধ্যস্থ' (৭ই বৈশাখ ১২৮০) এ দিনকার অনুষ্ঠানের এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন :

"৪॥০টার সময় ব্যায়াম আরম্ভের কথা ছিল, কিন্তু অত্যন্ত উষ্ণতা জন্য এক ঘণ্টা পরে হইল। লোকের জনতা বিস্তর হইয়াছিল। সাধারণতঃ ব্যায়ামের বৈচিত্র্য, নব নব কৌশল, আশাতীতরূপ অঙ্গচালনের পারিপাট্য—সুপ্রণালীবদ্ধ লম্ফ-ঝম্প, কূর্দ্দন, উত্থান, পতন, দণ্ডারোহণ, আবর্ত্তন, স্থান পরিবর্ত্তন, ক্ষিপ্রতা, ধাবন প্রভৃতি দৃষ্টি করিয়া দর্শকমাত্রেই পরম প্রীতি লাভ করিয়াছেন, এবং পুনঃপুনঃ আনন্দ প্রকাশ ও ধন্য ধ্বনিতে রঙ্গভূমি নিনাদিত হইয়া উঠিয়াছিল।

"হুগলীর শিক্ষক বাবু শ্যামাচরণ ঘোষ সমুদয় ব্যায়ামের অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন। জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক বাবু দীননাথ [illegible] এবং সুযোগ্য ছাত্র যোগীন্দ্রনাথ পাল ও রাজেন্দ্রলাল সিংহ, ইঁহারা সামান্য গুণপনা প্রদর্শন

করেন নাই। শুঁড়িপাড়ার সুরথচন্দ্র দে, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল এবং বিপিন বিহারী মণ্ডলের কৌশল দর্শনে দর্শকগণ মহা সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। পরিশেষে একটি ছাত্রকে গোর দেওয়া হইল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল তিনি মৃত্তিকানিম্নে নিমগ্ন ছিলেন। তাঁহাকে নির্ব্বিঘ্নে কবরোত্থিত হইতে দেখিয়া সকলের মহাবিস্ময় জন্মিয়াছিল।

"ফলতঃ সে দিবসের সমস্ত ব্যাপারই চমৎকার হইয়াছিল। যে স্থানে রঙ্গভূমি হয়, সেস্থান অতি মনোহর। রমাপ্রসাদবাবুর [রায়] বৈঠকখানা বাটী যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন তৎসম্মুখস্থ প্রশস্ত প্রাঙ্গণ-ভূমি এ-কর্ম্মের কেমন উপযুক্ত। অর্দ্ধচন্দ্রাকারে দর্শকগণ কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট; সায়ংকাল বিগত, বাসন্তী শুক্লপক্ষের শশধর মৃদু মধুর করদান করিতে-ছিলেন; মন্দ মন্দ মারুতহিল্লোলে সকলেরই শরীর স্ফূর্ত্তি-বিশিষ্ট; সর্ব্বোপরি রমাপ্রসাদবাবুর সুযোগ্য কনিষ্ঠ পুত্র বাবু প্যারীমোহন রায় মহাশয়ের সু-ব্যবস্থা ও সৌজন্য, এত সুখের বিষয় একত্রিত হওয়াতে দর্শক ও প্রদর্শকগণের মন যে প্রীত ও উৎসাহিত হইবে সন্দেহ কি?"

রাত্রি আটটার সময় ব্যায়াম প্রদর্শন সমাধা হইলে রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ব্যায়াম শিক্ষক ও ছাত্রগণের কৃতিত্বের বিস্তর প্রশংসা করিয়া বক্তৃতা করিলেন। রাজেন্দ্রলাল সিংহ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-বিরচিত একটি সুন্দর কবিতা সুললিত কণ্ঠে আবৃত্তি করেন। সর্ব্বশেষে মনোমোহন বসু মহাশয় প্রদর্শক ও উদ্যোক্তাগণের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া ব্যায়াম সম্বন্ধে এইরূপ বলেন। এখানেও দেখা যায় বসু মহাশয় 'স্বাধীনতা' কথাটি উচ্চারণ করিতেছেন:

"বাঙ্গালাদেশে দৈহিক উৎকর্ষের এইরূপ উৎসাহ দেখিয়া মনে এইরূপ একটি ভাব উদয় হইতেছে, যেন জ্ঞান নামক পুরুষ বিদ্যা নাম্নী রমণীর সহযোগে একটি অপূর্ব্ব কন্যার উৎপাদন করিলেন। সে কন্যার নাম যুক্তি। যুক্তি দিন দিন বর্দ্ধিতা ও বিবাহের যোগ্যা হইয়া উঠিল। তাহার পিতামাতা সুপাত্রের অভাবে মহা উদ্বিগ্ন। এমন সময় ব্যায়ামের বংশধর সাহস নামা

সুপাত্র প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে তাহাকে ঐরূপ গুণবতী কন্যা সম্প্রদান করিলেন। এই পবিত্র বিবাহ ঘটনা দৃষ্টি করিয়া আমাদের বিলক্ষণ আশা হইতেছে,"স্বাধীনতা"নাম্নী সুরমনোমোহিনী কন্যা জন্মগ্রহণ করিতে পারিবেন।"

নবগোপাল মিত্র

জাতীয় মেলা ও জাতীয় সভা দিন দিন বৰ্দ্ধিত হইয়া সমাজের মহা হিতকারী হইয়া উঠিল। নবগোপাল মিত্র এতদুভয়েরই প্রাণ ছিলেন। জাতীয় মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনেই মনোমোহন বসু মহাশয় ইহার ভাবী উন্নতির সম্ভাবনা দেখিয়া নবগোপাল সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন :

"সমাজের যতদূর বিশৃঙ্খলা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে এই দুরবস্থা চাক্ষুষ করিয়া কোন্ চিন্তাশীল হিন্দু স্থির থাকিতে পারে? কোন্ সুশিক্ষিত স্বদেশবৎসল মন প্রতিবিধানে অগ্রসর না হইয়া স্বীয় ধৰ্ম্ম প্রবৃত্তির উত্তেজনা ও ধিক্কারে বধির থাকিতে পারে? যে সকল মহাশয়গণের এরূপ উন্নত মন—যে সকল হিন্দুকুলোদ্ভব মহাত্মাগণ এইরূপ চিন্তাশীল, তাঁহারাই এই "চৈত্র-মেলা" নামা হিন্দুসমাজ বন্ধনের অদ্বিতীয় উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে সিমুলিয়া বাসী গুণরাশি, নির্ম্মৎসর, অধ্যবসায়ী শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্র মহাশয় সৰ্ব্বাগ্রগণ্য। যে সকল গুণদ্বারা বহুজনসাধ্য বৃহৎকাণ্ডের আবিষ্কর্ত্তা ও নিয়ন্তা হওয়া সম্ভব, তাঁহাতে সে সমস্ত গুণ সৰ্ব্বতোভাবে বিদ্যমান আছে। সেই মহৎ গুণাবলীর শৃঙ্খলে অন্যান্য স্বদেশহিতৈষী মহাশয়েরা আবদ্ধ রহিয়া কয়েকটি মধুমক্ষিকার ন্যায় অল্পে অল্পে ক্রমে ক্রমে স্বদেশের সৌভাগ্য মধুচক্র একখানি রচিত করিয়া তুলিতেছেন। অতএব তাঁহারা হিন্দুমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন।"—'বক্তৃতামালা', পৃ ৮-৯।

জাতীয় মেলার অষ্টম অধিবেশনে ইহার আশাতীত সাফল্যে উৎফুল্ল হইয়া মনোমোহন স্বীয় 'মধ্যস্থ' পত্রিকায় (ফাল্গুন ১২৮০) নবগোপালের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। অষ্টম অধিবেশনের বিবরণ প্রসঙ্গে তিনি প্রথমেই লেখেন :

"এতদিনে আমাদিগের প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের অবিচলিত অধ্যবসায়-তরুকে ফলোন্মুখ দেখা যাইতেছে। শুভক্ষণে বঙ্গদেশ এই মহাত্মাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। আমাদের এই উক্তিকে কোনো কোনো পক্ষীয় কোনো কোনো লোক অতিরিক্ত প্রতিষ্ঠাবাদ রূপে গণ্য করিতে পারেন। কিন্তু আমরা সর্ব্বদিক বিবেচনা, এরূপ বিষয়ের সকল কথা স্মরণ এবং অন্যান্য দেশহিতৈষীগণের সহিত ইঁহাব কার্য্যের তুলনা না করিয়া একথা বলি নাই। আমরা বহুবৎসরাবধি তাঁহার প্রকৃতি ও কার্য্যাদি পর্য্যালোচকের দৃষ্টিতে দেখিয়া ও পরীক্ষা করিয়া আসিতেছি—মধ্যস্থ প্রচারের বহু পূর্ব্ব হইতেও আমরা তদ্দর্শক আছি। তাঁহার কৃত অনুষ্ঠানসমূহ সম্বন্ধে অনেকবার অনেক প্রকাশ্য স্থলে স্বাভিপ্রায় মুখে ও লেখনীতে ব্যক্ত করা গিয়াছে, কিন্তু এতকালের এত সুযোগের মধ্যে তাঁহার নাম করিয়া অন্যকার মত কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠা অভিব্যক্ত করি নাই। না করিবার প্রধান কারণ তাঁহার স্বকীয় প্রার্থনা। অর্থাৎ তিনি যখনই কোনো উপলক্ষ্যে আমাদের দ্বারা তাহার কোনো উদ্যোগ দেখিতে পাইতেন, তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে সুমিষ্ট কৌশলে নিবারণ করিয়া রাখিতেন। সে নিবারণের তাৎপর্য্য আর কিছুই নয়, মনোগত ইচ্ছানুযায়ী কাজ যতদিন না হইতেছে—কাজের মত কোনো কাজ যতক্ষণ সমাজ-মধ্যে পূর্ণাবয়বে দৃষ্ট না হইতেছে, ততক্ষণ শুদ্ধ পরস্পরের ধন্যবাদ কোন্ কাজের? তাহাতে বরং অনিষ্ট বই ইষ্ট-সিদ্ধির সম্ভাবনা অল্প।

"এই সদ্ভাবটি মনে প্রাণে লাগিয়া আমরা কেবল চিন্তাকুল ও আশান্বিত হৃদয়ে ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক দর্শন ও অপেক্ষা করিতেছিলাম। ১২৭৯ সালের জাতীয় সভার উন্নতি দেখিয়া আশা ও হর্ষের বৃদ্ধি হইল। কিন্তু মেলার অনুষ্ঠানে কোন নব উন্নতি লক্ষিত না হওয়াতে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হইতে পারি নাই। এবারকার মেলায় পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অঙ্গের পরিবর্দ্ধন ও সুশৃঙ্খলা দর্শনে অন্তঃকরণ বহুলাংশে সন্তৃপ্ত ও সুস্থ হইয়াছে। প্রদর্শয়িতব্য দ্রব্য-

সম্ভারাদি সম্বন্ধে যে কিছু উন্নতি দৃষ্টি হইল, আমরা তন্নিমিত্ত অবশ্যই সন্তোষলাভ করিয়াছি ; কিন্তু মেলার কয় দিবস অধ্যক্ষগণ সুনিয়ম স্থাপন প্রভৃতি যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তদর্থে শতগুণে বেশী আশা ভরসা প্রাপ্ত হইয়াছি। বিশেষতঃ মেলার প্রধান অথচ শেষদিন রবিবারে আট আনা হারে প্রবেশ-*টিকিট* বিক্রয় দ্বারা যে অর্থ হইয়াছে তাহা অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহের বিষয়। আবার অর্থে সামর্থ্যে সমাজের উচ্চশ্রেণীস্থ সাহায্যদাতাগণের সংখ্যাবৃদ্ধি দেখিয়া এবারে এমন ভরসা জন্মিতেছে, যে, এই প্রার্থনীয় জাতীয় অনুষ্ঠান ক্রমে ক্রমে যথার্থ ই, সমাজ-শুভকরীরূপে তিষ্ঠিতে ও উন্নত হইতে পারিবে। এবার এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়াই সমাজ-বন্ধু মিত্র মহাশয়ের নামে তাঁহার প্রাপ্য প্রতিষ্ঠা উৎসর্গ না করিয়া নীরব থাকিতে পারিলাম না—এবার অন্তঃকরণ আপ্লুত হইয়া উঠিয়াছে, আর চুপ করিয়া থাকা যায় না !

"সেই প্রশংসাবাদ কি, কিসের এবং কতদূর দেয়, তাহাও সংক্ষেপে নিরূপণ করিয়া বলিব। অদ্য আমরা স্থানান্তরে "জাতীয় ভাবের" ব্যাখ্যা করিয়াছি,···অত্র বঙ্গদেশে বাবু নবগোপাল মিত্রই সেই জাতীয় ভাবের প্রথম ভাবুক ও প্রধান প্রচলন কর্ত্তা। তিনি বিদ্যালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে না হইতেই—তদবধি একাল পর্য্যন্ত ঐ পবিত্র ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া সমাজের অবস্থা, বান্ধবমণ্ডলীর সাহায্য ও স্বীয় বহুদর্শনজনিত জ্ঞানানুসারে সেই ভাবের রূপান্তরও উন্নতি যখন যেমন হউক, কিন্তু অনন্যকর্ম্মা ও অনন্যভাবুকরূপে অবিচলিতচিত্তে দৃঢ় অধ্যবসায় সহযোগে সেই পথের পথিক এবং সেই পবিত্র ব্রতের ব্রতী হইয়া আসিতেছেন। কিসে স্বীয় পৈতৃক সমাজ প্রকৃত সামাজিকতা, প্রকৃত জাতীয় ভাব, প্রকৃত স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি সদ্‌গুণে ভূষিত হইবে—কিসে তাহারা সমবেত চেষ্টা দ্বারা আপনাদের অবস্থা উন্নত করিবে—কিসে তাহাদিগের ভীরুতা ও স্বার্থপরায়ণতা অপগত হইবে—কিসে তাহারা অপর জাতীয়ের নিকট পূর্ব্ববৎ হেয় পদার্থ না থাকিয়া সভ্য সমাজের পাঁচটার মধ্যে একটা

হইতে পারিবে, তিনি এই চিন্তাতেই নিমগ্ন এই মহোদ্যোগেই ব্যাপৃত —এই অনুষ্ঠানেই কাল কাটাইতেছেন! তাঁহার মুখে 'জাতীয়, জাতীয়, জাতীয়!' তাঁহার সকল কার্য্যে 'জাতীয়, জাতীয়, জাতীয়।' তাঁহার প্রচারিত সংবাদপত্রের নাম 'জাতীয়!' তাঁহার যত্নে স্থাপিত সভার নাম 'জাতীয়!' বিদ্যালয়ের নাম 'জাতীয়।' ব্যায়ামশালার নাম 'জাতীয়!' মেলার নাম 'জাতীয়!' তিনি জাগ্রত অবস্থায় 'জাতীয়!' লইয়াই বিব্রত! তিনি সুপ্তাবস্থায় স্বপ্ন দেখেন 'জাতীয়!' তিনি জাগ্রত 'জাতীয়!' "

মনোমোহন এই প্রসঙ্গে নবগোপালের উৎসাহদাতা ও সহকর্ম্মীদের, যথা—রাজা কমলকৃষ্ণ, রাজা চন্দ্রনাথ রায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূজেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়, প্রাণনাথ পণ্ডিত, শ্যামাচরণ শ্রীমানী প্রভৃতির নামোল্লেখ করিয়া বলেন যে, "ইনি বলেন আমায় দেখ, উনি বলেন আমায় দেখ।" অর্থাৎ ইঁহারা প্রত্যেকেই জাতীয় মেলার উন্নতিকল্পে সমধিক তৎপর হইয়াছিলেন।

অষ্টম অধিবেশন, ১৮৭৪

জাতীয় মেলার অষ্টম অধিবেশনের সাফল্যে সন্তুপ্ত হইয়া 'মধ্যস্থ' নবগোপাল মিত্র সম্বন্ধে যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন তাহা এইমাত্র উল্লেখ করিলাম। এবারকার অধিবেশন হয় কলিকাতার অভ্যন্তরে পার্শী বাগানে ১১ই হইতে ১৫ই ফেব্রুয়ারী। জাতীয় মেলার অধিবেশন এই প্রথমবার কলিকাতা নগরীর অভ্যন্তর ভাগে হইল। এই কয় দিনের উৎসবের বিবরণও 'মধ্যস্থ' সংক্ষেপে দিয়াছেন। প্রথমেই 'মধ্যস্থ' লেখেন :

"এ বৎসর মাঘ-সংক্রান্তি বুধবার দিবসে মেলার কার্য্য আরব্ধ হইয়া ৪ঠা ফাল্‌গুন রবিবার পর্য্যন্ত ছিল। অন্যান্য বারে নগরের বাহিরে কোন দূরস্থ উদ্যানে মেলা হইত, এবারে শহরের মধ্যে মৃজাপুরস্থ বিখ্যাত পার্শী বাগানে তাহা হওয়াতে সাধারণের পক্ষে বড় সুবিধা হইয়াছিল। কিন্তু আট

আনা হারে প্রবেশ-টিকেটক্রয়ের নিয়ম হওয়াতে অন্যান্য বারের ন্যায় তত লোক হয় নাই। তথাপি সহস্র সহস্র মহাশয়েরা যে পদার্পণ করিয়াছিলেন, ইহাই পরম ভাগ্য··· ।”

প্রথম দিনের অপরাহ্নে মেলাক্ষেত্রেই জাতীয় সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইল। তাহাতে পরবর্ত্তী বর্ষের নিমিত্ত নিম্নলিখিতরূপে অবৈতনিক সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারীসমূহ মনোনীত হইলেন: রাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর অধ্যক্ষ সভার সভাপতি এবং রাজা চন্দ্রনাথ রায়, বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসু সহকারী সভাপতি; বাবু নবগোপাল মিত্র ও বাবু প্রাণনাথ পণ্ডিত, এম, এ, সম্পাদক; বাবু ভূজেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় তথা বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সংশ্লিষ্ট সম্পাদক পদে নিযুক্ত হইলেন।

“শুক্রবার জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পারিতোষিক বিতরণের কার্য্য মেলার উদ্যানেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎকালে রাজনারায়ণ বাবু ও প্রাণনাথ বাবু উৎসাহসূচক কিঞ্চিৎ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর উক্ত পারিতোষিক দান বিষয়ে বিস্তর অর্থানুকূল্য করিয়াছিলেন।”

“শনিবার দিবসীয় মেলায় নবগোপাল বাবু গত বৎসরের প্রধান প্রধান সামাজিক ঘটনা বিবৃত করেন। এবং অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদক বাবু শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক “বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ ও তন্নিবারণের উপায়” সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। তৎপরে রাজনারায়ণ বসু মেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঘটিত একটি বক্তৃতা করেন।

“রবিবার যে বৃহতী সভা হয়, তাহাতে রাজা চন্দ্রনাথ বাহাদুরের প্রধান আসন গ্রহণের কথা ছিল। কিন্তু তাঁহার হঠাৎ অসুখ হওয়াতে তাঁহার পরিবর্ত্তে বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। বাবু প্রাণনাথ পণ্ডিত কর্ত্তৃক সংক্ষেপে প্রাপ্ত সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পুস্তকাদির ‘বিবরণ লিপির পাঠ হইল।

“মন্তব্য লিপি পাঠ সমাপ্ত করা হইলে বাবু মনোমোহন বসু জাতীয়

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
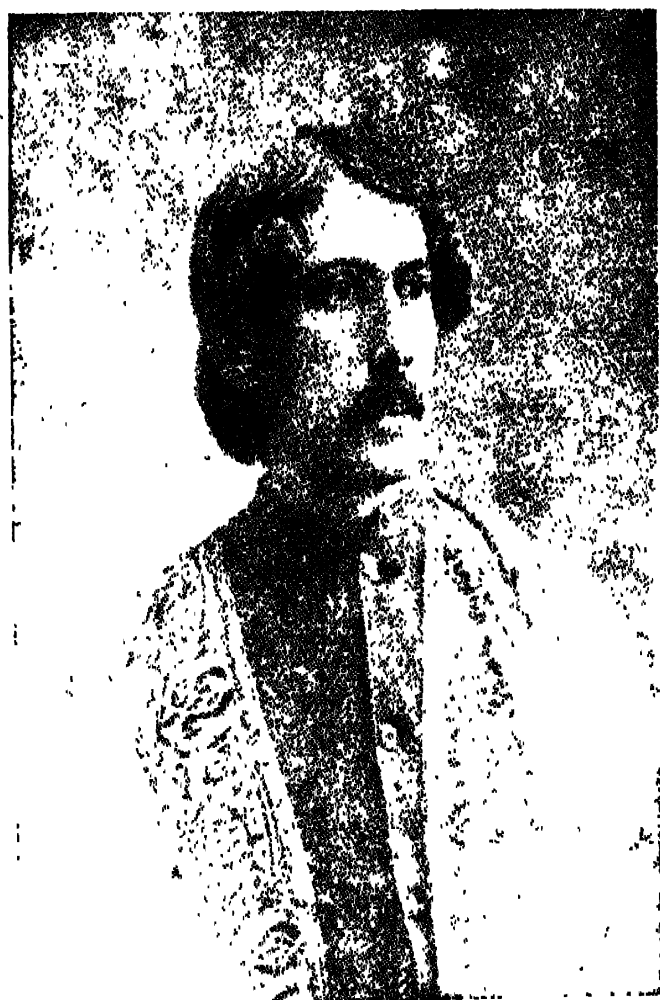
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভাব ও জাতীয় অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন।...তৎপরে সভাপতি মহাশয় মেলার বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণনা দ্বারা ভবিষ্যতের আশা ও উৎসাহের নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন...।

"রবিবারে যাহা যাহা প্রদর্শিত হয় তাহার তালিকা এই,

১। ক্ষেত্রজ বহুবিধ ধান্য তণ্ডুলাদি শস্য এবং উদ্যানজাত নানারূপ ফল মূল শাকশব্‌জি লতা গুল্ম ইত্যাদি।

২। শিল্প।

৩। জন্তু প্রদর্শন।

৪। নাটক। জাতীয় নাট্যশালার নটগণ অভিনেতা; ইহার নিমিত্ত এক টাকা হারে স্বতন্ত্র টিকিট।

৫। ব্যায়াম। ইহারও আট আনা হারে স্বতন্ত্র টিকিট হইয়াছিল।

৬। কুস্তি।

৭। বেদের ভেল্‌কি, সাপ-খেলানো, ভালুক লড়াই প্রভৃতি তামাসা।

৮। কুমারের চাক, তাঁতির তাঁত প্রভৃতি দেশীয় যন্ত্রের পরিচালন।

৯। আতশবাজী। প্রদর্শকগণকে যথোচিত পারিতোষিক প্রদত্ত হইয়াছিল।"

'অমৃতবাজার পত্রিকা' (১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৪) এবারে মেলার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদান করিয়া এই অধিবেশন সম্পর্কে একখানি পত্রসহ নিজ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেন। ইহার কিয়দংশ এই:

"হিন্দুমেলা এই সপ্তম * বৎসরে পদার্পণ করিল। এই তুফান ঝটিকার মধ্যে একজন বীর পুরুষ ইহাকে এই সাত বৎসর জীবিত রাখিয়াছেন। অনেক দিন হইল একজন মহাপুরুষ দেশের দুর্গতি দেখিয়া ব্যাকুল হন। তিনি গ্রীক দেশীয় অলিম্পিক গেমের ন্যায় এখানে একটি মেলার উদ্যোগ করেন। তিনি ইহার নাম ধনুর্যজ্ঞ রাখেন। ইহার নিমিত্ত দেশের কয়েকজন প্রধান ২

* ইহা ঠিক নহে। অষ্টম হইবে।

লোকের নিকট উপস্থিত হন। সংবাদপত্রেও ইহা লইয়া আলোচনা হয়। কিন্তু বিধাতা তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইতে দেন না। ইহার কিছুদিন পরে মেদিনীপুরে এই বিষয়ে কতক উদ্যোগ করা হয়। তাহার পর বাবু নবগোপাল মিত্র এই বৃহৎ ব্যাপারে কৃতসঙ্কল্প হন।······

"মেলা সম্বন্ধে আমরা একখানি পত্র প্রকাশ করিলাম। এবার মেলায় প্রবেশের নিমিত্ত টিকিট বিক্রয়ের রীতি করায় কেহ কেহ বিরক্ত হইয়াছেন। নবগোপালবাবু যদি সকলকে বিনা ব্যয়ে যাইতে দিতে পারিতেন তাহা হইলে ভাল হইত। এ বৎসর যেরূপ কলিকাতার নিকটে মেলার স্থান হইয়াছিল ইহাতে বোধ হয় বিস্তর লোকের সমাগম হইত। কিন্তু এ দোষ নবগোপাল বাবুর নহে, এ দোষ আমাদের। তিনি যথাসর্ব্বস্ব এই মেলার পাছে অর্পণ করিয়াছেন। ···টিকিট বিক্রয় দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, মেলার প্রতি অনেকের আন্তরিক স্নেহ আছে।

"কিন্তু হিন্দু মেলার উদ্দেশ্য যেরূপ মহৎ মেলাটি এখন পর্য্যন্ত তদনুরূপ বৃহত্তর হইল না ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।···এখন আমাদের মধুর ছাড়িয়া তিক্ত রসস্বাদ গ্রহণ করার প্রয়োজন হইয়াছে। আমরা যখন দেখিব হিন্দু মেলার সুবিস্তীর্ণ রঙ্গভূমি মল্ল বেশধারী হিন্দু সন্তানগণে পরিপূর্ণ হইয়াছে। বাঙ্গালীরা তেজস্বী অশ্বগণকে অবলীলাক্রমে ও অশেষ কৌশলে সঞ্চালন করিয়া দর্শকগণকে বিমোহিত করিতেছেন, যখন দেখিব হিন্দু-সন্তানগণ বন্দুক তলোয়ার প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া উদ্যমের সহিত উৎসাহ পূর্ব্বক দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরস্পার প্রবৃত্ত হইতেছে এবং পরস্পর পরস্পরের আঘাতে আঘাতিত হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে কেহ আহত পদে, কেহবা আহত হস্তে, কেহবা আহত মস্তকে রঙ্গস্থান পরিত্যাগ করিতেছেন, ও তদুপলক্ষে পুলিশ আসিয়া নবগোপাল বাবুর হস্ত ধরিয়া টানাটানি করিতেছে, সেইবার জানিব হিন্দু মেলার মহৎ উদ্দেশ্য অনেকাংশে সুসিদ্ধ ও সফল হইয়াছে।"

পঞ্চম অধ্যায়

জাতীয় ভাব প্রচার

জাতীয় সভার অধিবেশনাদি সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। মেলার অষ্টম অধিবেশনের পরে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মে একটি সভার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাইতেছে (অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৮ মে ১৮৭৪)। ইহাতে কবিবর মধুসূদন দত্তের মেঘনাদ-বধ কাব্যের দোষ ও গুণ বিষয়ে রাজনারায়ণ বসুর আলোচনা করিবার কথা ছিল। কিন্তু এ সভা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

জাতীয় সভার আর একটি অধিবেশন হয় ২১শে জুন দিবসে। এ এই অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই:

"গত রবিবারে জাতীয় সভার অধিবেশনে নাটোরের রাজা চন্দ্রনাথ রায়ের একটি বক্তৃতা [The Hindus of the 19th Century] করার কথা ছিল, কিন্তু তিনি সেই দিবস সন্ধ্যার সময় পীড়িত হইয়া পড়েন সুতরাং বক্তৃতা সভায় করা স্থগিত থাকে। অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে বাবু মনোমোহন বসু প্রস্তাব করেন যশোর জেলার নড়ালে যে একটি ব্যায়াম শিক্ষোৎসাহিনী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে জাতীয় সভা উক্ত সভার অনুষ্ঠাতা হিসাবে এই মহৎ কার্য্যের নিমিত্ত মনের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করেন। বাবু শিশিরকুমার ঘোষ প্রস্তাব করেন যে নড়ালের বাবু রাইচরণ রায় যিনি স্বহস্তে শতাধিক ব্যাঘ্র বধ করিয়াছেন, যাঁহার বীরপনা ইংরাজী বাংলা সমুদয় সংবাদপত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে, যাঁহাকে লইয়া দুর্ব্বল বাঙ্গালী জাতি গৌরব করিতে পারেন, জাতীয় সভার এমন পুরুষকে যথোচিত সম্মান করা কর্ত্তব্য, অতএব উক্ত সভা কর্ত্তৃক রাইচরণ বাবুকে একটি সম্মানসূচক স্বর্ণ মেডেল প্রদান করা হয়। উপরোক্ত প্রস্তাবদ্বয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভা কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হয়।

সভায় রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর, বাবু শ্যামাচরণ সরকার, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কুমার গোপীন্দ্র প্রভৃতি প্রধান প্রধান লোক উপস্থিত ছিলেন। রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।" —'অমৃতবাজার পত্রিকা', ২৫ জুন ১৮৭৪।

জাতীয় মেলার পরবর্ত্তী বার্ষিক অধিবেশনে রাইচরণ রায়কে বীরত্ব প্রকাশের জন্য একটি স্বুবর্ণ পদক দেওয়া হইয়াছিল, পরে জানা যাইবে। জাতীয় সভার আর কোন অধিবেশনের সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইতে দেখিতেছি না। তবে ইহাতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই। জাতীয় মেলা তথা জাতীয় সভার ভাবাদর্শ নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী ছাড়াইয়া সমগ্র দেশমধ্যে এই সময় ব্যাপ্তিলাভ করে। বাঙালী সৈনিক শ্রেণীতে প্রবেশ লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব, সাধারণ রঙ্গমঞ্চে জাতীয় শৌর্য্য-বীর্য উদ্দীপক নাটক অভিনয়ের জন্য ব্যগ্র, সাহিত্যে ও গানে জাতীয় ভাব প্রকাশে উদ্যত। জাতীয় মেলা ও জাতীয় সভার আন্দোলনের ফলে এমন কি গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত বিদ্যালয়সমূহে ব্যায়াম শিক্ষার সূচনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহা সিবিল সার্বিস পরীক্ষারও বিষয়ীভূত হইয়াছিল।

বাঙালী যুবক সরকারী সৈন্য-বিভাগে প্রবেশের যে সম্পূর্ণ উপযুক্ত ইহা প্রতিপাদন করিয়া নবগোপাল মিত্র ১লা জুন কলিকাতা টাউন হলে এক বক্তৃতা করিলেন। 'অমৃত-বাজার পত্রিকা' (৪ জুন ১৮৭৪) লেখেন :

"গত সোমবার টাউন হলে আমাদের দেশহিতৈষী বাবু নবগোপাল মিত্র একটি অপূর্ব্ব বক্তৃতা করিয়াছেন। ...ইনি সেই মহাপুরুষ যিনি দেশ উদ্ধার করিবার নিমিত্ত আপনার প্রাণ পণ করিয়াছেন।...নবগোপাল বাবু তাঁহার বক্তৃতায় নানারূপ উদাহরণ ও যুক্তির দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে আমাদের দেশীয়রা যেরূপ বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা বিখ্যাত হইয়াছেন, যদি গভর্ণমেণ্ট ইহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দেন তাহা হইলে ইঁহারা সমরেও বিখ্যাত হইতে পারেন।...তিনি বিশ্বাস করেন যে আমরা যে এ পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে কোনরূপ

বিক্রম দেখাইতে পারি নাই সে আমাদের দোষ না। ইংরাজেরা যে আমাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দেন নাই ইহা কেবল সেই নিমিত্ত।...”

এই সময় জাতীয় ভাবোদ্দীপক বহু নাটক রচিত ও অভিনীত হয়। এ প্রসঙ্গে মনোমোহন বসুর ‘হরিশ্চন্দ্র-নাটক’ (পৌষ ১২৮১) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ইহাতে যে দুইটি গান সংযোজনা করেন তা আমাদের তখনকার অবস্থার একটি সুন্দর চিত্র ত বটেই, অধিকন্তু তিনি ইহাতে যে-সব সমস্যার উল্লেখ করিয়াছেন তাহার সমাধান আজিও হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। গান দুইটি এই ঃ

(১)

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

নরবর নাগেশ্বর শাসন কি ভয়ঙ্কর!
দে কর, দে কর, রব নিরন্তর করের দায় অঙ্গ জর জর!
সিন্ধুবারি যথা শুষে দিনকর,
শোণিত শোষণ করে শত কর,
করদাহে নর নিকর কাতর,
রাজা নয়, যেন বৈশ্বানর!১॥
ভূমির কর মাত্র ছিল দেশে কর,
কে জানিত এত কর দুখাকর?
কর বিনা রাজা করে না বিচার,
ধর্ম্মে নয়, ধনে জয়ী নর!২॥
বাড়ী-ঘর-আলো-শান্তি-জল-কর—
স্থলপথে আর সেতুর উপর,
জলে গেলে তরী ধরে রাজচর—
শূন্য বই গতি নাহি আরো!৩॥

গো-অশ্ব-শকট-কর বহুতর—
পশু-নর, কারো নাহিক নিস্তার !
নীচ কর্ম্মে খাটে তাদের ধরে কর—
নীচাশয় এম্নি রাজ্যেশ্বর !৪॥
আয়-কর শুনে, গায় আসে জ্বর !
অস্থি-ভেদী রথ্যা-কর কি দুষ্কর !
লবণটুকু খাব, তাতেও লাগে কর !
কত আর কব মুনিবর !৫॥
মাদকতা-কর ছলে দেশময়,
মদ্যের বিপণি ; নিত্য বৃদ্ধি হয় ;
সে গরলে দগ্ধ ভারত নিশ্চয় !
হাহাকার রব নিরন্তর !৬॥

(২)

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

দিনের দিন সবে দীন হয়ে পরাধীন !
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা-জ্বরে জীর্ণ, অপমানে তনু ক্ষীণ !
সে সাহস বীর্য্য নাহি আর্য্য-ভূমে,
পূর্ব্ব গর্ব্ব সর্ব্ব খর্ব্ব হ'লো ক্রমে,
চন্দ্র-সূর্য্য-বংশ অগৌরবে ভ্রমে,
লজ্জা-রাহু মুখে লীন !১॥
অতুলিত ধন রত্ন দেশে ছিল,
যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল,
কেমনে হরিল কেহ না জানিল,
এম্নি কৈল দৃষ্টিহীন !২॥

তুঙ্গদ্বীপ হ'তে পঙ্গপাল এসে,
সার শস্য গ্রাসে, যত ছিল দেশে,
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভুষী শেষে,
হায় গো রাজা কি কঠিন !৩॥
তাঁতি, কর্ম্মকার, করে হাহাকার,
সূতা জাঁতা টেনে অন্ন মেলা ভার—
দেশী বস্ত্র অস্ত্র বিকায় নাকো আর,
হ'লো দেশের কি দুর্দ্দিন !৪॥
আজ যদি এরাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ
কলের বসন বিনা, কিসে রবে লাজ ?
ধ'র্ব্বে কি লোক তবে দিগম্বরের সাজ—
বাকল, টেনা, ডোর, কপীন !৫॥
ছুঁই, সূতা পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে,
দীয়াশলাই কাটী, তাও আসে পোতে—
প্রদীপটি জ্বালিতে ; খেতে, শুতে, যেতে
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন !৬॥

হিন্দুকলেজের কৃতী ছাত্র ও সে যুগের একজন বিচক্ষণ সাহিত্যিক-ছিলেন মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র। তিনি ইংরেজীতেই বেশীর ভাগ লিখিতেন। তিনি শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'মুখার্জ্জিস ম্যাগাজিনে' (আগষ্ট ১৮৭৪ এবং জানুয়ারী, জুন ১৮৭৬) ভারতবাসীর ব্যবসা শিল্প বাণিজ্য বিলোপ ও আর্থিক দুর্গতির কথা ওজস্বিনী ভাষায় ব্যক্ত করিয়া ইহা হইতে উদ্ধারের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমাদের পূজা-পার্ব্বণে, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকলাপে, শয়নাগারে, এমন কি দূরস্থ পল্লীর দীনতম কুটিরে তখন বিলাতী দ্রব্য প্রবেশ করিয়াছে। ইহার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে ভোলানাথ বলিয়াছেন :

"Without using any physical force, without

incurring any disloyalty, without praying for any legislative succour, it lies quite in our power to regain our lost position. 'It would be no crime' for us to take to the only but most effectual weapon—moral hostility —left us in our last extremity. Let us make use of this potent weapon by resolving to non-consume the goods of England. Let us always remember that the progress of India rests with the people themselves, and that her material prosperity must spring more from their own energy, perseverance and self-reliance than from any modification of the existing laws.

ভোলানাথের মতে অন্য কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া আমরাই ইহার প্রতিকার করিতে পারি। সকলে মিলিয়া প্রতিজ্ঞা করিব যে, আমরা কেহই বিলাতী দ্রব্য স্পর্শ করিব না। তাহা হইলে আমাদের উদ্দেশ্য অনেকাংশে সিদ্ধ হইতে পারে। জাতীয় মেলার অন্যতম উদ্দেশ্য—আত্মনির্ভর। ভোলানাথও বলিতেছেন, এই আত্মনির্ভর দ্বারা আমাদের কার্য্য সিদ্ধ হইবে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে এই আশার বাণীও আমাদের শুনাইয়াছেন:

The increased knowledge, energy and wealth of the Indians of the 20th or 21st century, would enable them to follow both agriculture and manufactures, to develop the subterranean resources, to open mines and set up mills to launch ships upon the ocean and carry goods to the doors of consumers in England and America."*

* শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ "মনীষী ভোলানাথ" পুস্তকে (২য় সং, পৃ. ১৫৪-১৭৪) উক্ত প্রবন্ধনিচয় হইতে বহু আবশ্যক অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

অর্থাৎ, বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীর ভারতবাসীরা তখন মাত্র কৃষিজীবী থাকিবে না, কৃষি ও শিল্প উভয় কর্ম্মেই তাহারা লিপ্ত হইবে, ভূগর্ভস্থ খনিজ দ্রব্যাদি উদ্ধার করিবে, কল স্থাপন করিবে, সমুদ্রে জাহাজ ভাসাইয়া ইংলণ্ড আমেরিকাবাসীদের ব্যবহারের নিমিত্ত তাহাদেরই গৃহকোণে আমাদের শিল্পজাত দ্রব্য পৌঁছাইয়া দিবে। স্বদেশী আন্দোলনের স্থচনার চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে জাতীয় মেলা যে জাতীয়তার প্লাবন বহাইয়াছিল তাহার দরুনই তখন আমাদের এসব চিন্তা সম্ভবপর হয়।

একটু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জাতীয় মেলা প্রবর্ত্তিত ব্যায়াম-অনুশীলন তৎকালীন সরকার গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ বিদ্যালয়ে প্রচলিত করান। ১৮৭৩, ১১ই এপ্রিলে জাতীয় সভার উদ্যোগে কলিকাতায় একটি "মহা-ব্যায়াম-প্রদর্শন" হইয়াছিল। ১৮৭৫, ৭ই জানুয়ারী সরকার এইরূপ একটি ব্যায়াম-প্রদর্শনের আয়োজন করেন। সরকারী স্কুলের ছাত্রদের মধ্যেই ইহা নিবদ্ধ রাখা হইবে জানিয়া 'অমৃত-বাজার পত্রিকা' (১৭ ডিসেম্বর ১৮৭৪) ইংরেজী স্তম্ভে লিখিয়াছিলেন :

To hold a gymnastic tournament without the students of the National [School] is to perform the act of Hamlet without the hero. We do not think that without the trained students of the school the tournament cannot be made worth seeing.

যাহা হউক, জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বাদ দিয়াই সরকারী ব্যায়াম-প্রদর্শন হইয়া গেল। ইহার বিবরণও কম কৌতুকপ্রদ নহে, এজন্য 'সুলভ-সমাচার' (১২ জানুয়ারী ১৮৭৫) হইতে ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল :

"বাঙ্গালীর ছেলেরা সময়ে আহার, সময়ে নিদ্রা ও সকল প্রকার খেলা পরিত্যাগ করিয়া দিনরাত্রি পুস্তকের উপর বিড় বিড় করিয়া বকিয়া ক্রমে জুজু হইবার উপক্রম হইতেছিল, আমাদের ছোটলাট ক্যাম্বেল সাহেব ইহা

দিব্য চক্ষে দেখিয়া এদেশীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ব্যায়াম শিক্ষা, সাঁতার দেওয়া, ঘোড়ায় চড়া এবং ভূমি জরিপের ব্যবস্থা করিয়া দেন। তাঁহারই যত্নে ও ইচ্ছায় এক্ষণে অনেক স্থলে ব্যায়াম আরম্ভ হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন স্কুলের ছেলেরা কে কেমন এই বিদ্যা শিখিতে পারিয়াছে তাহার পরীক্ষার জন্য গত বৃহস্পতিবার [৭ জানুয়ারী ১৮৭৫] বেলা ১১টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আলিপুরের ছোটলাট সাহেবের বাড়ীর মাঠে ব্যায়াম শিক্ষার লড়াই হইয়া গিয়াছে। হুগলী, পাটনা, ঢাকা ও বহরমপুর কলেজ, কলিকাতার মাদ্রাসা কলেজ, কলিকাতার নর্ম্মাল স্কুল, হাবড়া স্কুল ও বারাকপুর স্কুল প্রভৃতি নানা স্থানের বিদ্যালয় হইতে ছেলেরা পরীক্ষা দিতে আসিয়াছিল। অনেক সাহেব এবং রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বাবু কৃষ্ণদাস পাল, মান্যবর মৌলবী আব্দুল লতিফ খাঁ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক তামাসা দেখিতে ও বালকদিগকে উৎসাহ দিতে আসিয়াছিলেন। জোড়াদণ্ড (প্যারেলাল বার্স), দোল (ট্রাপিজিয়ম), অঙ্গুরীয় (রিঙ্গস্) মই খুঁটী-দণ্ড এবং কাঠের ঘোটকের উপর বালকেরা আশ্চর্য্য ক্রীড়া সকল করিয়া দর্শকদিগকে মোহিত করিয়া দিল। হস্তের কব্জা বাহু, সমস্ত হাত, সমুদায় শরীরের উপর জোর দিয়া বাজীকরদিগের অপেক্ষাও অদ্ভুত কুস্তি সকল দেখাইতে লাগিল। দুই হাতের উপর ভর দিয়া পা আকাশের দিকে উচ্চ করিয়া যোড়াদণ্ডের উপর চলিয়া যাইতে লাগিল, কেহ দড়ির উপরে গিয়া সোজা লম্বা হইয়া খাড়া হইয়া রহিল, কেহ অঙ্গুরীয় মধ্যে পা প্রবেশ করিয়া দিয়া চকরী বাজীর মত ঘুরিতে লাগিল, কেহ দড়ির উপর ডন খাইতে আরম্ভ করিল, কেহ মইএর পশ্চাৎ দিক হইতে ঝুলিয়া অদ্ভুত রূপে তড়াক তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া চলিল, দণ্ডের উপর দুইটা ছেলে পরস্পরে পরস্পরের বুক পা দিয়া জড়াইয়া নাগর দোলার মত ঘুরিতে লাগিল, এইরূপ নানা চতুরতা ও কৌশল দেখাইয়া ভিন্ন ভিন্ন কলেজ স্কুলের ছেলেরা পরস্পরে জিতিতে ও পরস্পরকে হারাইতে লাগিল। আশ্চর্য্য! বাঙ্গালীর ছেলে

হইয়া রৌদ্রে পড়িয়া সমস্ত দিন এইরূপ ঘোর পরিশ্রম করিয়াও দমিল না। লড়াইয়ের মধ্যে সকলেই বাঙ্গালীর ছেলে, কেবল ৩ জন মুসলমান ও একটি সাহেবের ছেলে ছিল।"

এই প্রতিযোগিতায় ঢাকা কলেজের ছাত্রবৃন্দ শীর্ষস্থান অধিকার করে। পরবর্ত্তী ১৪ই জানুয়ারী 'অমৃতবাজার পত্রিকা' পুনরায় লেখেন যে, "নেশন্যাল স্কুলের ছাত্রদিগকে পরীক্ষার নিমিত্ত অনুমতি না দেওয়ায় অত্যন্ত অন্যায় কাজ হইয়াছে। তবে আমরা এ গৌরব করিতে পারিব যে, এদেশে যে ব্যায়াম চর্চ্চার উন্নতি হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ উক্ত স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা বাবু নবগোপাল মিত্র।"

নবম অধিবেশন, ১৮৭৫

জাতীয় মেলার বাৎসরিক অধিবেশনের সময় যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল ততই নবগোপাল মিত্র মহাশয় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া ইহার আয়োজন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে লাগিয়া গেলেন। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (৪ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৫) ইংরেজী স্তম্ভে লিখিলেন, "Babu Nobogopal has left off eating, sleeping and is roaming from door to door." এবৎসর পার্শীবাগানে মেলার অনুষ্ঠান হইল, এবং পাঁচ দিন পর্য্যন্ত ইহার অধিবেশন চলিল। এবারে সভাপতি হইলেন রাজানারায়ণ বসু মহাশয়। 'সোমপ্রকাশ' (১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৮৭৫) প্রথমেই লেখেন:

"হিন্দু মেলা। ... ৩০এ মাঘ ইহার কার্য্য আরম্ভ হইয়া আজ (৪ ফাল্গুন) শেষ হইবে। এ মেলাটি বাবু নবগোপাল মিত্রের দৃঢ়তর যত্নের ফল। ইহা আজিও যে নির্ব্বাণ হয় নাই, নবগোপাল বাবুর অস্খলিত অধ্যবসায়ই তাহার কারণ। ইহা ক্রমেই শ্রীসম্পন্ন হইতেছে। আমরা প্রথম প্রথম ইহার ধরণ দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম, এ দেশের হরিদ্বার, হরিহরছত্র ও বারুণী প্রভৃতি মেলার ন্যায় এটীও একটী উৎসব ক্ষেত্র হইল, কিন্তু এখন দেখিতেছি

ইহা ক্রমে আমোদ-ক্ষেত্র না হইয়া কার্য্যক্ষেত্র হইয়া উঠিতেছে। আমাদিগের দেশের বিদ্বান্ ও বিজ্ঞ লোকেরা মেলাস্থলে বসিয়া দেশের মঙ্গল চিন্তা করিতেছেন। কি উপায়ে দেশের কৃষি-বাণিজ্যাদির শ্রীবৃদ্ধি হয়, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের উন্নতি হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসী হিন্দুরা একবাক্য হইয়া স্বদেশের কল্যাণ চিন্তা করেন, এই চেষ্টা হইতেছে। এগুলি অনল্প আহ্লাদের বিষয় সন্দেহ নাই।..."

মেলাস্থলে প্রতিদিনকার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্বন্ধে উক্ত পত্রিকায় যে তালিকা বাহির হয় তাহা হইতে জানা যায়—

প্রথম দিবস—বৃহস্পতিবার ৩০ মাঘ। রাজশ্রীকমলকৃষ্ণ বাহাদুরের সভাপতিত্বে জাতীয় সভার সাম্বৎসরিক উৎসব। পূর্ব্ববৎসরের সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা।

দ্বিতীয় দিবস—শুক্রবার ১ ফাল্গুন। প্রথমতঃ জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে পারিতোষিক বিতরণ। পরে কিরূপে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি হইতে পারে এই বিষয়ের আলোচনার্থ একটি সভা অনুষ্ঠান।

তৃতীয় দিবস—শনিবার ২ ফাল্গুন। সকল স্থানের ব্যায়াম-পারদর্শিগণের একযোগে ব্যায়াম প্রদর্শন। গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় অথবা স্বাধীন বিদ্যালয়, সকল স্থানের ছাত্রেরা ঐ ক্ষেত্রে ব্যায়াম-নৈপুর্ণ্য প্রদর্শন করিতে পারিবেন। উৎকৃষ্ট ছাত্রগণকে পারিতোষিক প্রদান এবং ব্যায়ামকুশল ছাত্রগণের উৎসাহ-উদ্দীপনার্থ প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্গলার আনন্দমোহন বসু কর্ত্তৃক বক্তৃতাদান।

চতুর্থ দিবস—রবিবার ৩ ফাল্গুন। এই দিবস মেলার প্রধান দিবস। এই দিবস পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত বক্তৃতাপাঠ, কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি প্রদর্শন, ব্যায়াম, বাজি প্রভৃতি অনুষ্ঠান। অধ্যাপক মৌলাবক্সের সঙ্গীত। অধিকন্তু এ বৎসর কলিকাতার নেপালী, পঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুদিগকে একত্রিত করা হইবে। সকলে মিলিয়া হিন্দুসাধারণের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির বিষয় কথোপকথন ও আলোচনা করিবেন।

পঞ্চম দিবস—সোমবার ৪ ফাল্গুন। এই দিবস মালী ও শিল্পীদিগকে পারিতোষিক প্রদানপূর্ব্বক মেলার কার্য্য সমাপন।

বিজ্ঞাপিত কার্য্যক্রম অনুসারে সব কাজ নির্ব্বাহিত হইয়াছিল কিনা জানা যায় না। তবে এবারকার অধিবেশনও সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত এবং কয়েকটি বিষয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হইয়াছিল। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (১৪ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৫) এ বিষয়ে লেখেন :

"গত মেলায় একটি মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়। যশোরান্তর্গত নড়ালের অন্যতম জমিদার বাবু রাইচরণ রায় তাঁহার বীরত্ব ও সাহসের জন্য মেলাকর্তৃক সম্মানিত হন। রাইচরণ বাবু বাল্যকালাবধি ব্যায়াম চর্চ্চা করিয়া স্বহস্তে অন্যূন দেড়শত মনুষ্য হন্তা ব্যাঘ্র বধ করিয়াছেন। তিনি পুর্ব্বে তরোয়ার দিয়া সম্মুখ যুদ্ধে ব্যাঘ্র বধ করিতেন,...রাইচরণ বাবুর এই বাঙ্গালী দুর্লভ বীরত্ব ও সাহসের জন্য হিন্দু-মেলার কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে একটি স্বর্ণ মেডেল প্রদান করেন।

"হিন্দুমেলার সংস্থষ্ট জাতীয় সভা কর্ত্তৃক প্রথম এদেশে ছাত্রদিগের মধ্যে ব্যায়াম চর্চ্চার সূত্রপাত হয়। এইক্ষণ স্কুল কলেজ যেখানে যেখানে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ব্যায়াম শিক্ষার শ্রেণী খোলা হইয়াছে, তথাকার প্রায় সকল ব্যায়াম শিক্ষকগণ জাতীয় সভার বিদ্যালয়ের ছাত্র। এমন কি জাতীয় সভা দ্বারা পূর্ব্বে ছাত্র সকল শিক্ষিত না হইলে গবর্ণমেণ্টের ব্যায়াম শ্রেণী সকল শিক্ষকাভাবে আদৌ প্রতিষ্ঠিত হইত না। হিন্দু মেলার দ্বারা দেশের এই একটি প্রত্যক্ষ মহদুপকার সাধন হইয়াছে। জাতীয় সভায় ব্যায়াম বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের ব্যায়াম কৌশল আমরা সেদিন প্রত্যক্ষ করিলাম। প্রসিদ্ধ ডাক্তার পরলোকগত বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি পুত্র [সুবিখ্যাত ক্যাপ্টেন জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়] অসীম শক্তিধর পুরুষ হইয়া উঠিয়াছেন। আমরা দেখিলাম তিনি অর্দ্ধমণ ওজনের একটি প্রকাণ্ড লৌহপিণ্ড ঊর্দ্ধে নিঃক্ষিপ্ত করিয়া অবলীলাক্রমে বাহুদ্বয়ের মাংসপেশীর উপর

বারম্বার ধারণ করিতে লাগিলেন। যে অনুষ্ঠান দ্বারা এইরূপ বিষয় সকল প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে তাহা হিন্দু মাত্রেরই আদরের ধন হওয়া উচিত।"

বিখ্যাত গায়ক অধ্যাপক মৌলাবক্সের উল্লেখ আমরা পাইয়াছি। তিনিও সঙ্গীতনৈপুণ্যের জন্য একটি স্বুবর্ণপদক প্রাপ্ত হন। রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন ঃ

"১৮৭৫ সালে যে মেলা হয় তাহার সভাপতির কার্য আমি সম্পাদন করি।...এই মেলা উপলক্ষে বরদাবাসী সুবিখ্যাত মৌলাবক্সের* গান হয় এবং যশোহরের নড়ালনিবাসী জমিদার রাইচরণ রায় ব্যাঘ্র শিকারে নৈপুণ্য জন্য এক স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হয়েন। আমি সভাপতিরূপে ঐ পদক তাঁহার গলায় পরাইয়া দিই। মৌলাবক্স তাঁহার সঙ্গীত ক্ষমতা দেখাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।"

এবারকার অধিবেশনের আর একটি বিষয়ও বিশেষ স্মরণীয়। এবারেই সর্ব্বপ্রথম কিশোর রবীন্দ্রনাথ (রবীন্দ্রনাথ তখন চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক) সাধারণ সমক্ষে দাঁড়াইয়া "হিন্দুমেলার উপহার" শীর্ষক স্বরচিত একটি কবিতা

* মৌলাবক্স সম্বন্ধে 'সুলভ সমাচার' (৭ই মাঘ ১২৮১) লেখেন :

"মৌলাবক্স খাঁ নামে একজন সঙ্গীতের অধ্যাপক কিছুদিন হইল কলিকাতায় আসিয়াছেন। ইহার আদি নিবাস মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে, এক্ষণে বরদার মহারাজার রাজ্যে অধিবাস করেন। সঙ্গীতে ইঁহার বিদ্যাবুদ্ধি দেখিয়া সকলেই সুখ্যাতি করিতেছে। বাস্তবিক ইনি গান বাদ্যের বিদ্যাকে গুলিয়া খাইয়াছেন। তিনি সঙ্গীত বিদ্যা সম্বন্ধে যে সকল কথা বলেন, আমরা তাহা সংক্ষেপে লিখিতেছি। তিনি বলেন—মূল সঙ্গীত বিদ্যা হিন্দুদিগের। হিন্দু রাজাদের সময়ে সঙ্গীতের বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল, তখন সঙ্গীত মুখে মুখে শিখিতে হইত না, সঙ্গীতের শাস্ত্র ছিল তাহাতে গানের অক্ষর মাত্রা তান লয় লিখিত থাকিত। সঙ্গীত বিদ্যা যে হিন্দুদিগের তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই, গানের রাগিণী সকলের নামই তাহার প্রমাণ (যথা ভৈরব, ভৈরবী ইত্যাদি)। হিন্দুদিগের সঙ্গীত দেবতাদিগের স্তব স্তুতি পূর্ণ ছিল, তাহাতে ধর্ম্মসাধনের সুবিধা হইত।...

মৌলাবক্স খাঁ বলেন তিনি ইংরাজদের ন্যায় পঞ্চাশ হাজার লোককে একসঙ্গে গান করাইতে পারেন। ইংরাজদের রীতি এবং আমাদের দেশের রীতি একত্র করিয়া সঙ্গীতশাস্ত্র প্রস্তুত করিলে ঐক্যতান গান অনায়াসে প্রচলিত হইতে পারে।"

আবৃত্তি করেন। *The Indian Daily News* (১৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৫) লেখেন:

Babu Robindra Nath Tagore, the youngest son of Baboo Debendra Nath Tagore, a handsome lad of some 15, had composed a Bengali poem on Bharat (India) which he delivered from memory; the suavity of his tone much pleased his audience.

(রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়ে" উদ্ধৃত)

রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটি পরবর্ত্তী ২৫ ফেব্রুয়ারী তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিক'ায় প্রকাশিত হয়।

দশম অধিবেশন, ১৮৭৬

জাতীয় মেলার নবম ও দশম অধিবেশনের মধ্যবর্ত্তী এক বৎসর বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয়। আনন্দমোহন্ বসুর স্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশন বা ছাত্রসভায় দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নব্য ইটালী, ম্যাটসিনি, শিখশক্তির অভ্যুদয় প্রভৃতি শীর্ষক যে-সব বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে বঙ্গের যুবক-সমাজ একেবারে যেন মাতিয়া উঠিয়াছিল। শিশির-কুমার ঘোষ, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ দেশের চিন্তাশীল নেতৃবর্গ সাধারণ শিক্ষিতের অধিগম্য একটি রাষ্ট্রীয় সভা প্রতিষ্ঠায়ও তৎপর হইয়াছিলেন। তাঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে ১৮৭৫, ২৫শে সেপ্টেম্বর 'ইণ্ডিয়ান লীগ' নামে একটি সর্ব্বসাধারণের রাজনৈতিক সভা গঠিত হইল। জাতীয় মেলা যে-সব উদ্দেশ্য সাধনে এতদিন তৎপর ছিলেন তাহাও এই সভার কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য হইল। ইহার প্রধান অনুষ্ঠাতা নবগোপাল মিত্রও এই সভার কর্ম্মকর্ত্তৃসভায় স্থানলাভ করিলেন। জাতীয় মেলা একাকী যে-সব কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, এতদিনে সাহিত্য, নাটক, কাব্য, পুস্তক,

পত্রিকা, সংবাদপত্র, রঙ্গমঞ্চ এবং ইণ্ডিয়ান লীগের মত রাষ্ট্রীয় সভার মধ্য দিয়া তাহা বস্তুগত হইবার অবকাশ পাইল। যাহা হউক, ইহার পরও জাতীয় মেলার বার্ষিক অধিবেশন হইতে লাগিল। জাতীয় মেলার দশম অধিবেশন হইল ১৮৭৬, ১৯শে ও ২০শে ফেব্রুয়ারী রাজা বদনচাঁদের টালা-উদ্যানে। এবারে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 'সোমপ্রকাশ' (২৮ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৬) বলেন, "এ বৎসর হিন্দু মেলায় আন্দুল নিবাসী বাবু গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একটি অক্ষর নির্ম্মাণের ও কাগজ প্রস্তুত করিবার কল প্রদর্শন করেন।" কবি ও সাহিত্যিক বিহারীলাল সরকার অধিবেশনে কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন। ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৬ দিবসীয় 'সাধারণী'তে এই অধিবেশনের একটি বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়। ইহা এখানে প্রদত্ত হইল ঃ

"গত শনি ও রবিবার টালার জলের কলের সন্নিকটস্থ রাজা বদনচাঁদের বাগানে হিন্দুমেলা হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিবস দেশীয় স্ত্রীলোকগণের শিক্ষা কৌশল পরিচায়ক কার্পেটের জুতা, টুপী, আসন, ছবি প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই সকলের মধ্যে ক্ষীরোদমোহিনী নামাঙ্কিত কার্পেটের স্থচিকার্য্য দেখিতে স্থন্দর ও পরিপাটী হইয়াছিল। দুটি বালিকা বিদ্যালয় হইতে দুটি করিয়া চারিটি বালিকা আসিয়া সভাসমক্ষে স্ব স্ব রচিত প্রবন্ধ পাঠ করে। সভাপতি বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর উক্ত বালিকা চতুষ্টয় ও সাধারণ বালিকা বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষক ও অধ্যক্ষগণকে সভাসমক্ষে অনুরোধ করেন, যেন বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বালিকারা জাতীয় ভাব রক্ষা করিতে শিক্ষা করে। জাতীয় ভাব কাহাকে বলে, জাতীয় ভাব কি, বালিকাগণের দূরে থাকুক, উপস্থিত সভ্যগণেরও হৃদয়ঙ্গম করিতে দ্বিজেন্দ্র বাবু সক্ষম হইয়াছিলেন কিনা, সন্দেহ। জাতীয় ভাব যদি বাঙ্গালী অত শীঘ্র বুঝিতে পরিবে ত ভাবনা কি? মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত ও বাদ্য হইয়াছিল। বিকালে ব্যায়াম পরীক্ষা হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (কৈশোর)

"শনিবার মেলার উদ্যোগপর্ব্ব, রবিবারেই মেলার দিন। প্রাতঃকালে বাছখেলা হইয়াছিল, দশ বারখানা নৌকা সমবেত হইয়াছিল, কোন্নগর ও দক্ষিণেশ্বরের নৌকাই বাছখেলায় এককালে গঙ্গার অপর পার হইতে চিৎপুরে কালী সিংহের ঘাটে উপস্থিত হয়। এই দুই নৌকাই পুরস্কার পাইবে স্থির হইল। উক্ত দিবস নানাবিধ কৃষিজাত সংগৃহীত হইয়াছিল। অকালের কয়েকটি ফল ব্যতীত কৃষিজাতের মধ্যে মেলার উপযোগী কত পদার্থ দেখিলাম না। উদ্যানজাত গুটিকত ফুলগাছ দেখিতে বড়ই সুন্দর হইয়াছিল। এই দিবস প্রকৃত পক্ষে একটি সভা হইয়াছিল। বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। সভাস্থলে ন্যূনাধিক একশত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। প্রথমতঃ কতকগুলি পদ্য পঠিত হয়। পদ্যগুলির সমুদয়ই স্বদেশহিতৈষিতার উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ।

"একটি অল্প বয়স্ক বালক যেরূপ দুঃখ ও অভিমান ভরে একটি পদ্যের আবৃত্তি করেন, তাহাতে সকলেই স্তব্ধ ও সাশ্রুনয়ন হইয়াছিল। সকলেরই শিরার উপর শোণিতের সঞ্চরণ অনুভূত হইয়াছিল। এ সকল পদ্য শুনিয়া ভারতমাতার পূর্ব্ব সৌভাগ্য ও ইদানীন্তন হতশ্রী—উজ্জ্বল ভাবে সকলের মনে চিত্রিত হইয়াছিল। সকলেই বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহারা মহদ্বংশজাত, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মহাপুরুষ ছিলেন এবং এক্ষণে তাঁহারা বীর্য্যশূন্য হইয়াছেন। সকলেরই কর্ত্তব্যজ্ঞান, স্বভাবতঃ সেই সময় জাগরূক হইয়াছিল। ইহার পর বাবু মনোমোহন বসু একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। দুই এক গ্রাম্য অলঙ্কার ব্যতীত বক্তৃতাটি মধুরতাময়, উপদেশ-পূর্ণ এবং হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ইনি হিন্দু মেলার প্রধান উদ্দেশ্য সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। শিক্ষা এবং স্বাবলম্বনই মেলার প্রধান উদ্দেশ্য। সুন্দর সুন্দর কৃষিজাত প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত কৃষক-গণকে আহ্বান করিয়া উপযুক্ত মত পুরস্কার প্রদান করিলে, কৃষি বিদ্যায়

দেশীয় লোকের বিশেষ যত্ন জন্মাইতে পারে। একটি সূতার কল মেলায় আনীত হইয়াছিল। উহাতে অল্পায়াসে অধিক পরিমাণ সূতা অল্পসময়ের মধ্যে প্রস্তুত হইতে পারে। গত বৎসর সীতানাথ বাবু একটি কাপড়ের কল প্রস্তুত করিয়াছেন। এটি গোরু, মহিষ, বাষ্প কিম্বা মনুষ্য দ্বারা [চালিত] হইতে পারে। একজন লোক একদমে এই কল দ্বারা বিশ হাত কাপড় বুনিতে পারে। কলটি মেলায় প্রদর্শিত হয় নাই, কিন্তু উক্ত কলের কাপড় দেখা গিয়াছিল। বস্ত্র তাদৃশ পরিষ্কৃত নহে, কিন্তু এই প্রথম উদ্যম, ভবিষ্যতে কাপড় ম্যানচেষ্টারের মত হইতে পারে। মনোমোহন বাবু এই দুই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া মেলার উদ্দেশ্য সকল প্রতিপন্ন করিলেন। যাহাতে এদেশ কোন বিষয়ে অন্য দেশের মুখাপেক্ষা না করে অর্থাৎ যাহাতে আমাদের দেশে স্বাবলম্বন জন্মে, এই বিষয় বলিতে গিয়া মনোমোহন বাবু এই নির্দ্দেশ করেন, যে প্রকৃত দেশহিতৈষী আমাদের মধ্যে নাই। উন্নতির যে যে উপকরণ প্রয়োজনীয়, ভারতে সে সমুদয়ই আছে, একজন মনের মত দেশহিতৈষী নাই। যাঁহারা হিতৈষী বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত, দেশহিতৈষী বলিয়া ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত যাঁহাদিগের নাম শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই রায় বাহাদুর কিম্বা রাজা বাহাদুর দেশহিতৈষী, স্বার্থপর দেশহিতৈষী। অবশেষে মনোমোহন বাবু উপস্থিত সভ্য-মণ্ডলীকে শিল্পচর্চ্চা করিতে অনুরোধ করেন। ইদানীং ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অবস্থা দিন দিন অতি মন্দ হইতেছে। দেশের ভাল মন্দ অবস্থা এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে সুতরাং যাহাতে অস্মদ্দেশীয় মধ্যবিত্তগণের অবস্থা উন্নত হয়, এরূপ কোন উপায় বিধান করা আদৌ কর্ত্তব্য। মনোমোহন বাবুর মতে এদেশে শিল্পচর্চ্চা বৃদ্ধি হইলে, এ দেশের লোক স্বাবলম্বন শিক্ষা করিলেই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের

অবস্থা ভাল হইবে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে দেশের উন্নতি হইবে। এই মর্ম্মে মনোমোহন বাবু বক্তৃতা শেষ করিলে, বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জাতি চরিত্র বিষয়ক একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন। বিজাতীয়গণ বিশেষতঃ ইংরাজগণ সভাস্থলে সংবাদপত্রে এবং পুস্তকে বাঙ্গালী চরিত্রে অনেক দোষারোপ করেন এবং সেইরূপ দোষারোপ যে অন্যায়, নগেন্দ্র বাবু সুন্দররূপে তাহা প্রতিপন্ন করিলেন। পূর্ব্বকালের ভারতবর্ষীয়গণ সত্য-বাদী ও সত্যপ্রিয়, ইহার প্রমাণ নগেন্দ্র বাবু, আয়িরান ও হিউন স্যাংয়ের নাম করিয়া বলিলেন যে, এই উভয় পর্য্যটকই স্ব স্ব প্রণীত পুস্তকে ভারত-বাসীরা সত্যপ্রিয়, তাহাদের মধ্যে প্রবঞ্চক নাই, স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। পরে নগেন্দ্র বাবু ইংরাজগণের চরিত্র যে পবিত্র নহে, ইহা ম্যাটজিনি, বকল, হামিল্টন, হ্যালাম প্রভৃতির লিখিত গ্রন্থ হইতে ইংরাজের দোষ বর্ণনা করিয়া সপ্রমাণ করিলেন। আমাদের জাতীয় চরিত্র ভাল, ইহা প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্য কি? নগেন্দ্র বাবু বলিলেন, ইহাতে আত্মগৌরব বাড়ে এবং আত্মগৌরব শুভ সাধক ইহা বলা বাহুল্য। অবশেষে সভাপতি বালকগণের পক্ষে উৎসাহ, মনোমোহন বাবুর বক্তৃতায় কর্ম্ম এবং নগেন্দ্র বাবুর বক্তৃতায় ধর্ম্ম বিষয়ে সভ্যগণ শিক্ষালাভ করিল, ইহা বুঝাইয়া দিলেন। ইহার পর সভা ভঙ্গ হইল।

"পরে উদ্যানের স্থানে স্থানে বাজি, কুস্তী, লাঠিখেলা, সঙ্গীত, বাদ্য ও ব্যায়াম হইতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় আতশবাজী পুড়িল। এই সকল অতিশয় আনন্দদায়ক হইয়াছিল। বস্তুতঃ হিন্দু মেলা একেবারে নির্জ্জীব, একথা আমরা বলি না, ইহা দ্বারা নানাবিধ শুভ সাধিত হইতেছে, কিন্তু আকারানুরূপ মঙ্গল দেখি না। সাধারণের ইহার প্রতি তাদৃশ যত্ন নাই, ইহা সামান্য ক্ষোভের বিষয় নহে।"

এই অধিবেশনের সময় বাঙালী যুবকদের সঙ্গে ফিরিঙ্গীদের একটা

সংঘর্ষ হয়। বিপিনচন্দ্র পাল নবগোপাল মিত্রের জাতীয় ব্যায়ামশালার ছাত্র ছিলেন। তিনি এবৎসর জাতীয় মেলায় যোগ দেন। সংঘর্ষে বিপিনচন্দ্র পাল, জিতেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, সুন্দরীমোহন দাস প্রভৃতি যুবকবৃন্দ লিপ্ত ছিলেন। বিপিনচন্দ্র পুলিস কর্তৃক ধৃত হন এবং বিচারে তাঁহার কুড়ি টাকা জরিমানা হয়। বিপিনচন্দ্র তাঁহার ইংরেজী আত্ম-জীবনীতে (পৃঃ ২৬৬-৮) এ সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন। যাহা হউক, এবারের অধিবেশন দুই দিনেই সম্পন্ন হইল।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরবর্ত্তী কার্য্য

জাতীয় মেলা কয়েক বৎসর যাবৎ যেরূপ সাড়ম্বরে চলিয়া আসিতেছিল, নবম ও দশম অধিবেশনে সেরূপ সমারোহ না হওয়ায় 'সোমপ্রকাশ', 'সাধারণী' প্রভৃতি সংবাদপত্র আক্ষেপ করিয়াছিলেন। জাতির উন্নতিকল্পে বিভিন্ন বিষয়ে এই মেলা যেরূপ প্রেরণা দিতেছিল তাহাতে ইহার অবনতিতে আক্ষেপ হইবারই কথা। তবে, এতদিন পরে পূর্ব্বাপর্য্য আলোচনা করিয়া দেখিলে মনে হয় জাতীয় মেলা যে উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হইয়াছিল তাহা জাতির শিক্ষিত-সাধারণের মধ্যে তখনই অনেকাংশে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল। ছাত্রসভায় সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা, ইণ্ডিয়ান লীগ প্রতিষ্ঠা, রঙ্গমঞ্চে জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাটকাদির অভিনয়, জাতীয় সঙ্গীত পুস্তকাকারে প্রকাশ, বাংলা সাহিত্যের উন্নতি-বিষয়ে আলোচনা প্রভৃতির কথা আমরা জানিতে পারিয়াছি। জাতীয় মেলা যে বাঙালীর প্রাণে স্বদেশানুরাগ ও স্বাবলম্বন-স্পৃহা উদ্রেক করিয়াছিল, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে এসব তাহারই অনুক্রম বলিলে এতটুকুও অত্যুক্তি করা হইবে না।

দশম অধিবেশনের পরবর্ত্তী আর একটি প্রধান ঘটনা—১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারত-সভা প্রতিষ্ঠা। এই সভা প্রতিষ্ঠার মূলে প্রত্যক্ষ কি কি কারণ ছিল সে সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিবার আবশ্যক নাই, তবে স্বদেশবাসী জনসাধারণের হিতকল্পে যে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে দ্বিমত নাই। মূল উদ্দেশ্য বর্ণনা করিতে গিয়া চন্দ্রনাথ বসু বলেন, "যে যে

বিষয়ে দেশের ইষ্টানিষ্ট অনুস্যূত রহিয়াছে, যে যে বিষয়ের উপর দেশীয় জনসাধারণের সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে, সভা তৎসমস্ত বিষয়েই লক্ষ্য করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইবেক। উদারতা সহকারে এরূপ প্রশান্তভাবে কার্য্য করাই সভার উদ্দেশ্য।"* স্বদেশের হিতকল্পে দশ জনে মিলিয়া কার্য্য করিবার যে সাধু ইচ্ছা তখনকার বাঙালী মনে উদিত হইয়াছিল তাহার মূলে রহিয়াছে প্রধানতঃ এই জাতীয় মেলার শিক্ষা। এই দিনকার সভায় জাতীয় মেলার প্রধান উদ্যোক্তা নবগোপাল মিত্র মহাশয়ও যোগদান করেন এবং ভারত-সভার অধ্যক্ষ-সমিতির সভ্যগণের নাম উল্লেখ করিয়া ইহা গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনিও ইহার অন্যতম অধ্যক্ষ হইলেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান সভাও এই সময়ে (২৯ শে জুলাই ১৮৬১ প্রতিষ্ঠিত হইল।

একাদশ অধিবেশন, ১৮৭৭

জাতীয় মেলার এ অধিবেশনেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের রীতি অনুসৃত হইয়াছিল। এবারকার অধিবেশন বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই বলিয়া দুঃখ করিয়া 'সাধারণী'তে (৪ মার্চ্চ ১৮৭৭) এক ব্যক্তি লেখেন :

"দেখিবার মধ্যে একটি কাপড়ের কল, দেশীয় দেশলাই (match box), কালি এবং সাবান দেখিলাম।...কি করিয়া 'মিরার' সম্পাদক মেলার কৃতকার্য্যতা স্বীকার করিয়াছেন জানি না,...।"

কিন্তু এবারকার মেলা যে একেবারে ব্যর্থ হয় নাই তাহা এই লেখকের লেখা হইতেই জানা যাইতেছে। সপ্তদশবর্ষীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সদ্যগত দিল্লীর দরবার সম্পর্কে স্বরচিত যে কবিতাটি আবৃত্তি

-৩০ জুলাই, ১৮৭৬ : "ভারত সভা"।

করিয়াছিলেন তাহা উপস্থিত সকলেরই চিত্তহারী হইয়াছিল। এই লেখকই বলিতেছেন :

"আমরা নিরাশ মনে নবগোপাল বাবুকে অভিসম্পাত করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিলাম, এমন সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্র বাবুর পুত্র জ্যোতিরিন্দ্র এবং রবীন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। রবীন্দ্র বাবু 'দিল্লীর দরবার' সম্পর্কে একটি কবিতা এবং একটি গীত রচনা করিয়াছিলেন। আমরা একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ ছায়ায় দুর্ব্বাসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার কবিতা এবং গীতটি শ্রবণ করি। রবীন্দ্র এখনও বালক, তাঁহার বয়স ষোল কি সতর বৎসরের অধিক হয় নাই। তথাপি তাঁহার কবিত্বে আমরা বিস্মিত এবং আর্দ্রিত হইয়াছিলাম, তাঁহার সুকুমার কণ্ঠের আবৃত্তির মাধুর্য্যে আমরা বিমোহিত হইয়াছিলাম। যখন দেখিলাম যে বঙ্গের একটি সুকুমারমতি শিশু ভারতের জন্য এরূপ রোদন করিতেছে, যখন দেখিলাম যে তাহার কোমল হৃদয় পর্য্যন্ত ভারতের অধঃপতনে ব্যথিত হইয়াছে, তখন আশাতে আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। তখন ইচ্ছা হইল রবীন্দ্রের গলা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলি—আয় ভাই 'আমরা গাইব অন্য গান।' একজন সুপরিচিত কবিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি দ্রবিত হৃদয়ে বলিলেন যখন এই কবি প্রস্ফুটিত কুসুমে পরিণত হইবে, তখন দুঃখিনী বঙ্গের একটি অমূল্য রত্ন লাভ হইবে।"

এই সুপরিচিত কবি আর কেহই নহেন, "পলাশির যুদ্ধে"র কবি নবীনচন্দ্র সেন। নবীনচন্দ্র "আমার জীবনে" (চতুর্থ ভাগ, পৃ. ২৬৪) এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন :

"স্মরণ হয় ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে* আমি কলিকাতায় ছুটিতে থাকিবার সময়ে কলিকাতার উপনগরস্থ কোনও উদ্যানে 'নেশনাল মেলা' দেখিতে

* ইহা ঠিক নহে, ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ হইবে।

গিয়াছিলাম।...একজন সন্থ-পরিচিত বন্ধু মেলার ভিড়ে আমাকে 'পাকড়াও' করিয়া বলিলেন যে একটি লোক আমার সঙ্গে পরিচিত হইতে চাহিতেছেন। তিনি আমার হাত ধরিয়া উদ্যানের এক কোণার এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ তলায় লইয়া গেলেন, দেখিলাম সেখানে সাদা ঢিলা ইজার চাপকান পরিহিত একটি সুন্দর নবযুবক দাঁড়াইয়া আছেন। বয়স ১৮।১৯, শান্ত স্থির। বৃক্ষ তলায় যেন একটি স্বর্ণ মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। বন্ধু বলিলেন—'ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ।' তাঁহার জ্যেষ্ঠ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার সহপাঠী ছিলেন। দেখিলাম সেই রূপ, সেই পোষাক, সহাসি-মুখে করমর্দ্দন কার্য্যটি শেষ হইলে, তিনি পকেট হইতে একটি 'নোটবুক' বাহির করিয়া কয়েকটি গীত গাহিলেন, ও কয়েকটী কবিতা গীতকণ্ঠে পাঠ করিলেন। মধুর কামিনী-লাঞ্ছন কণ্ঠে, এবং কবিতার মাধুর্য্যে ও স্ফুটোন্মুখ প্রতিভায় আমি মুগ্ধ হইলাম।"

'সাধারণী'র উক্ত লেখক এ বৎসরকার অধিবেশন সম্বন্ধে নিজ মত ব্যক্ত করিয়া সর্ব্বশেষে লেখেন :

"উপসংহারকালে আমরা নবগোপাল বাবুকে জিজ্ঞাসা করি এই জাতীয় মেলার উদ্দেশ্য কি? শুনিতে পাইতেছি, 'ইণ্ডিয়ান লীগ' ও নব প্রসূত 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' একাঙ্গে পরিণত হইবার কথা হইতেছে, যদি তাহা হয় তবে এই মেলা সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটি প্রস্তাব করিবার ইচ্ছা রহিল।"

এই লেখকের লিখিবার ধরণ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ইণ্ডিয়ান লীগ ও ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জাতীয় মেলার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিবার আর সার্থকতা নাই, কেননা ইহার উদ্দেশ্য ঐ দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই ভুক্ত হইয়া গিয়াছে।

পরবর্ত্তী অধিবেশনসমূহ

দ্বাদশ অধিবেশন (১৮৭৮) হইতে জাতীয় মেলা মাঘ-সংক্রান্তির পরিবর্ত্তে সরস্বতী পূজার সময়ে হইতে থাকে। এই সময় হইতে ইহাতে তেমন আর সমারোহ হইত বলিয়া মনে হয় না। কারণ এ সময়কার যে-সকল পত্রিকা দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছে তাহাতে এ সম্পর্কে বিশেষ কোন বিবরণ পাই নাই। ১৮৭৮, ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখের 'সাধারণী'র সংবাদ-স্তম্ভে মেলা সম্বন্ধে মাত্র কয়েক পঙ্‌ক্তি বাহির হইয়াছে। এই সময় একমাত্র নবগোপাল মিত্রই ইহার পরিচালনা করিতেছিলেন জানা যাইতেছে। 'সাধারণী' লেখেন:

"নবগোপাল বাবুর হিন্দু মেলার এখন ত্রুটি আছে। এখন যে সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা ঠিক হইয়াছে। কিন্তু যেরূপ স্থানে করিলে মেলায় অধিক লোকের সমাগম হইবে, তাহা নবগোপাল বাবু এখন ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। হয় কলিকাতার মধ্য স্থলেই করিতে হইবে অথবা রেলওয়ে ষ্টেশনের ধারে কোন বর্দ্ধিষ্ণু নগরে বা গ্রামে করা চাই। এবার যেখানে হইয়াছে তাহা দুয়ের বাহিরে।...শিয়ালদহ ষ্টেসনের নিকটে করিলেই ভাল হইত। মেলায় দুই এক দিন সাধারণ লোকজনকে বিনা টিকেটে ছাড়িয়া দেওয়া চাই। রীতিমত পালোয়ানের কুস্তী হওয়া চাই। এমন কি ৪।৫ ঘণ্টা কুস্তী হইবে, ৫।৭ মিনিটের কুস্তী বিড়ম্বনা মাত্র। যদি সং রাখিতে হয়, ভাল কারিকর দিয়া সং গড়ান আবশ্যক। ভরসা করি নবগোপাল বাবু এই সকল পরামর্শে কর্ণপাত করিবেন। তিনি যে এতকাল হিন্দু মেলা জীবিত রাখিয়াছেন, আমরা তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দি।"

ত্রয়োদশ অধিবেশনের (১৮৭৯) কোনও বিবরণ পাই নাই। চতুর্দ্দশ অধিবেশন সম্পর্কে 'সুলভ সমাচার' (১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০) লেখেন:

"২৯শে মাঘ হইতে রাজাবাজার ব্রজনাথ ধরের বাগানে হিন্দু মেলা আরম্ভ হইয়াছে, ইহার উন্নতি না হইয়া দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। বাঙ্গালীর উৎসাহ খড়ের আগুন।"

যে-যে উদ্দেশ্যে জাতীয় মেলা আবির্ভূত হইয়াছিল তাহা ব্যাপকতর-ভাবে সংসাধন জন্য সংস্কৃতি ও রাজনীতিমূলক নানা প্রতিষ্ঠান তখনই স্থাপিত হইয়াছিল। কাজেই ইহার অবনতি হইলেও দুঃখ করিবার কিছু নাই। কিন্তু সমসাময়িক লোকের নিকট ইহার হ্রাসপ্রাপ্তি স্বভাবতঃই আক্ষেপের কারণ হইয়াছিল। জাতীয় মেলার অধিবেশন কোন্ বৎসর হইতে বন্ধ হইয়া যায় তাহা এখনও জানিতে পারি নাই।

জাতীয় সঙ্গীত

জাতীয় মেলা জাতীয় জীবনে যে প্রেরণা দিয়াছিল তাহার ফলে বাঙালী সমাজ স্বদেশের উন্নতিকল্পে সবিশেষ তৎপর হইয়া উঠিয়াছিল সন্দেহ নাই। কৃষি, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শারীর-চর্চ্চা বিভিন্ন বিষয়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তাহারা উদ্যোগী হইয়াছিল—পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি। তথাপি এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ বিশেষ ভাবে করিতে হইবে, কেননা প্রধানতঃ জাতীয় মেলার অনুষ্ঠান হইতেই তাহার উৎপত্তি। এই বিষয়টি হইল জাতীয় সঙ্গীত। বাংলার সাহিত্য জাতীয় সঙ্গীতে সমুজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ। এই সমৃদ্ধির মূলে রহিয়াছে জাতীয় মেলার প্রেরণা। ইতিপূর্ব্বে ডিরোজিও ও কাশীপ্রসাদ ঘোষ ইংরেজী কবিতায় দেশমাতৃকার বন্দনা করিয়াছেন; গুপ্তকবি, রঙ্গলাল ও মধুসূদন ছন্দে জন্মভূমির ও জননী বঙ্গভাষার প্রশস্তি করিয়াছেন। কিন্তু ছন্দ ও সুরে দেশমাতার বন্দনা প্রশস্তি জাতীয় মেলা হইতেই আরব্ধ হয়। জাতীয় মেলার প্রথম অধিবেশন উপলক্ষে কোন্ কোন্ সঙ্গীত

রচিত ও গীত হইয়াছিল তাহা জানা না গেলেও পরবর্ত্তী অধিবেশনসমূহে গীত কয়েকটি সঙ্গীতের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় অধিবেশনে 'মিলে সবে ভারত সন্তান" গানটি গীত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এই সঙ্গীতটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ইহার রচয়িতা যে সুপ্রসিদ্ধ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধিবেশনে আর একটি বিখ্যাত সঙ্গীত গীত হয়—"লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে।" ইহার রচয়িতা মেলার প্রথম সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়। এই দুইটি সঙ্গীত ব্যতীত জাতীয় মেলায় গীত অন্যান্য সঙ্গীতের রচয়িতাদের নাম কি কার্য্যবিবরণীতে, কি সমসাময়িক পত্র-পত্রীতে, কি দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "জাতীয় সঙ্গীত" শীর্ষক সঙ্কলন-পুস্তকে কোথাও দেওয়া হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ হিন্দু মেলার শেষের দিক্‌কার কোন কোন অধিবেশনে শুধু স্বরচিত কবিতাই আবৃত্তি করেন নাই, স্বরচিত সঙ্গীতও গান করিতেন। কিন্তু জাতীয় মেলায় গীত বলিয়া উল্লেখ না থাকায় তাঁহার গীতাবলী হইতে এগুলি বাছাই করিয়া লইবার উপায় নাই। যাহা হউক, এই মেলায় গীত বলিয়া যে-সব সঙ্গীতের উল্লেখ পাইতেছি তাহা হইতে কয়েকটি মাত্র এখানে প্রদত্ত হইল। জাতীয় মেলা বাঙালীর প্রাণে যে কি গভীর প্রেরণা দিয়াছিল এই সঙ্গীতগুলিই তাহার প্রমাণ।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা

১

মিলে সবে ভারত সন্তান, একতান মনপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান ॥

২

ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান ?
কোন অদ্রি হিমাদ্রি সমান ?

ফলবতী বসুমতী, স্রোতঃস্বতী পুণ্যবতী ;
শত খনি রত্নের নিধান ॥
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয় ॥

৩

রূপবতী সাধ্বী সতী, ভারত ললনা,
কোথা দিবে তাদের তুলনা ?
শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিরতা
অতুলনা ভারত ললনা ॥
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয় ॥

৪

বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ,
বিশ্বামিত্র ভৃগুতপোধন।
বাল্মীকি বেদব্যাস, ভবভূতি কালিদাস,
কবিকুল ভারত ভূষণ ॥
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,

গাও ভারতের জয়,
কি ভয়, কি ভয়,
গাও ভারতের জয় ॥

৫

বীর-যোনি এই ভূমি বীরের জননী ;
অধীনতা আনিল রজনী,
সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির,
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমনি ॥
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয় ॥

৬

ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ,
পৃথুরাজ আদি বীর গণ ?
ভারতের ছিল সেতু, যবনের ধূমকেতু
আর্ত্ত বন্ধু দুষ্টের দমন ॥
হোক্ ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয় ॥

৭

কেন ডর ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,
যতো ধর্ম্ম স্ততো জয় ॥
ছিন্ন ভিন্ন হীন বল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয় ?
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয় ॥

রাগিণী বাহার—তাল জৎ

লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে।
লুঠিতেছে পরে এই রত্নের আকরে ॥
সাধিলে রতন পাই, তাহাতে যতন নাই।
হারাই আমোদে মাতি অবহেলা করে ॥
দেশান্তর-জনগণ, ভুঞ্জে ভারতের ধন,
এ দেশের ধন হায়, বিদেশীর তরে ॥
আমরা সকলে হেথা, হেলা করি নিজ মাতা,
মায়ের কোলের ধন নিয়ে যায় পরে ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঝাঁপতাল

সতত রত হও যতনে, দেশহিত সাধনে
একমত ভাব ধরি, এক তানে।
অতুল বল মিলন হয়, সফল হয় মনন চয়
বিমল সুখ সলিল বয়, বিদ্যমানে ॥

কি ছিল গুণ কি হল বল, কি হল সব বিভব বল,
ধিক জনম ধন বিফল হীন মানে।
বিনয় করি বচন ধর, খন অলস গরল, হর,
যশ কুসুম চয়ন কর পুলক প্রাণে॥

রাগিণী মূলতান—তাল একতালা।

কবে উদিবে সৌভাগ্য ভানু ভারতবরষে।
পোহাইবে দুঃখ নিশা প্রভাত পরশে॥
সভ্যতা সরোজ লতা, প্রাপ্ত হবে প্রবলতা,
প্রস্ফুটিবে সুখাম্বুজ, মানস সরসে।
উন্নতি মরাল কুলে, ভ্রমিবে সলিলে কুলে,
প্রকৃতি প্রমোদে ভুলে, হাসিবে হরিষে॥
উৎসাহেরি উপবনে, একতার সুপবনে,
কামনা কুসুম কলি ফুটিবে সরসে;
দেশহিতাকাঙ্ক্ষি জনে, অলিসম সদাক্ষণে,
মাতিবে মোহিত হয়ে মধুময় রসে॥

রাগিণী পরজ—তাল একতালা।

ছাড়হে অসার অলস, প্রস্তুত হও লভিতে যশ!
সাধন কর ভারতের, উন্নতি জন সমাজে।
নিরখি দেখ কাল বিকল, পূর্ব্ববিভব সকল বিফল।
অঙ্গ ভঙ্গ জন্ম-ভূমি, নত শির হয় লাজে॥
যাহে দুখ ভার যায়, একতায় সে উপায়।
ত্যজ ত্যজ ঔদাস্য ভাব, রত হও নিজ কাযে॥
মিলনে হয় হীন সবল, মিলিলে অতি লঘুতৃণ দল,
পায় লৌহ শৃঙ্খল বল, বান্ধে গজরাজে॥

রাগিনী সিন্ধু-কাফি—তাল ঢিলা তেতালা।

আসি ভারতভূমে, একবার দেখে যাও আর্য্যগণ।
কোথা, ব্যাস বশিষ্ঠ বাল্মীকি আদি জনক সনক সনাতন
বুক ফাটে কি বলব আর, ভারতভূমি চেনা ভার,
নাই আচার, নাই অধিকার, আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন।
পাপেতে পুরেছে রাজ্য, লোপ হয়েছে বৈধকার্য্য,
হারাইয়ে বল বীর্য্য, হলো দাসত্ব অবলম্বন।
ছিল যে গৌরব কত, সকলি হইল গত,
কীর্ত্তি হত বৃত্তি হত, এবে হত হয় জীবন।
ধনধান্য রত্নভার, সব যায় সিন্ধু পার,
উঠিয়াছে হাহাকার কেহ না করে শ্রবণ।
রেখে গিয়েছিলেন সেই, শাস্ত্ররূপ শস্ত্র এই,
আজও রক্ষা পায় সেই কোনরূপে ধর্ম্ম ধন।
ভ্রাতৃভাব আর নাই দেশে, দগ্ধ হয় দেশ দ্বেষে দ্বেষে।
আর একবার সদুপদেশে, কর সব দুঃখ মোচন।

রাগিনী আলেয়া—তাল কাওয়ালি।

এই ধরাতলে, ধন্য ধন্য ক্ষত্রিয় ললনা।
যবন প্রয়াণকালে, পড়িয়া জঞ্জালজালে
সহিলে কতই যন্ত্রণা
পরশিলে দুরাশায়, সতীত্ব যাবে এই ভয়ে,
অনলে জীবন ঢালিয়ে ভয় ভাবনা।
জ্বালিতে সমরানল, করিতে দেশের কুশল
দিলে ভূষণ সকল, হয়ে প্রসন্ন বদনা
স্বদেশের অনুরাগে, বিরাগে আর মনোরাগে,
পাঠালে যবনের আগে, সুতে করি উত্তেজনা!
যত দিন রহিবে ক্ষিতি, তত দিন রহিবে খ্যাতি,
তোমরাই প্রকৃত সতী, সাধ্বী পতি-পরায়ণা।

পরিশিষ্ট

(ক) তৃতীয় অধিবেশনের বিশদ বিবরণ

জাতীয় মেলার তৃতীয় অধিবেশনের (১৮৬৯) বিবরণ ২রা বৈশাখ ১২৭৬ সালের 'সংবাদ প্রভাকরে' একটু বিশদ ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ইহা আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। এ অধিবেশনের কথা মুদ্রিত হইবার পরে বিরবণটি হস্তগত হওয়ায় এখানে ইহা দেওয়া হইল। এই সংখ্যাখানি খণ্ডিত, এজন্ত সকল কথার পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই:

"গত রবিবার চৈত্রী সংক্রান্তি উপলক্ষে মৃত বাবু আশুতোষ দেবের বেলগেছিয়ার উদ্যানে তৃতীয় বার্ষিক চৈত্র মেলা সমারোহ পূর্ব্বক নির্ব্বাহিত হইয়াছে। কলিকাতা ও উপনগরের প্রায় সমস্ত প্রধান লোক প্রদর্শন-স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আপামর সাধারণ প্রায় সাত সহস্র দর্শকের সমাগম হইয়াছিল। প্রথমে প্রদর্শন-সভার প্রশ্নমতে যাঁহারা যে কয়েকটি প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে পুরস্কার প্রদত্ত হয়। তাহার পর গীত বাদ্য, রাসায়নিক ক্রীড়া, ব্যায়াম ক্রীড়া ও রায়বাঁশ প্রভৃতি নানাবিধ ক্রীড়া হইয়াছিল। সকল গুলিতেই দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দের তৃপ্তি সাধিত হইয়াছে। সংস্কৃত বেণীসংহার নাটকের অভিনয় হইবার কথা ছিল কিন্তু ঘটনা ক্রমে তাহা ···প্রাপ্ত হয় নাই। সূত্রধারের প্রবেশের অব্যবহিত পরেই দর্শকগণের মধ্যে অপরিহরণীয়···গ হওয়াতে অভিনয় বন্ধ হইয়া যায়, বস্তুতঃ সেরূপ ঘটনা না হইলে কোনক্রমে সুচারুরূপে হইতে পারিত। কারণ যে স্থানটিতে রঙ্গ···নীত করা হইয়াছিল, সেটি···তাদৃশ স্থলে একে ত সাধারণ অভিনয় হইতে পারে না, তাহাতে মেলাস্থল, ছয় সাত সহস্র লোকের সমাগম,—একটি নূতন কাণ্ড হইতেছে দেখিলে সকলেই সেদিকে ধাবিত হইতেন, (প্রারম্ভকালে তাহা হইয়াও ছিল) তাদৃশ জনতার মধ্যে

নাটকের অভিনয় কখনই হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রকাশ্য মেলায় তাহার কল্পনা করাই অপরামর্শ হইয়াছিল।

"মুখ্য কল্প শিল্প ও উদ্ভিজ্জ প্রদর্শন। তদ্বিষয়ে কমিটি অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এদেশীয়া কুলকন্যাগণের কারুকার্য্য দর্শন করিয়া আমরা সবিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছি। কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে এক গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমন করিয়াছিলাম প্রত্যেক গৃহেই নূতনত্ব ও চমৎকারিত্ব লক্ষিত হইয়াছে। বাবু কাশীশ্বর মিত্র, বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ দেব, বাবু দেবেন্দ্র মল্লিক এবং বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিবিধ চমৎকার বস্তু সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণপ্রস্তরের প্রতিমা, শ্বেত প্রস্তরের মন্দির, মস্‌জিদ, গৃহ, পশু, পক্ষী, সর্প ও পুত্তলিকা, এবং বৃষ কুকুর শিশু প্রভৃতিও অতি উত্তম হইয়াছিল। বাবু আশুতোষ দেবের বাটির স্ত্রীগণ, সিন্দুরিয়া পটির মল্লিক পরিবার, বাবু প্রিয়নাথ দত্তের স্ত্রী, বাবু দ্বারকানাথ দেবের স্ত্রী এবং অন্যান্য গুণবতী নারীগণের শিল্পনৈপুণ্যের···সন্তোষকর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অনেকেই জরীর কাজ, কারপেটের কাজ, জড়াও কাজ, কারপেটের···ধান্যের অলঙ্কার, তণ্ডুলের হার···বস্ত্রের মাল্য, জুতা, আসন, বর্ণম,···এবং অন্যান্য বস্তু বিশেষ গুণপনার সহিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণুতে সজ্জিত করিয়া আনিয়াছিলেন। মৃত্তিকা ও ক্ষীরের অ···নিচু, গোলাপজাম, মাদার এবং···দীয় ফল অতি সুন্দর হইয়াছিল। তখন সমস্ত দর্শন করিয়া কেহই কৃত্রিম বোধ করিতে পারে নাই। দিল্লীর একটি স্ত্রীলোকের প্রেরিত সাঁচ্চা কাজ এবং বস্ত্রাদি অতি মনোহর হইয়াছিল। শোভাবাজারের রাজবাটি এবং অন্যান্য বনিয়াদী বড়মানুষের বাড়ী হইতে কতকগুলি প্রাচীন মূল্যবান বস্তু প্রেরিত হয়। সেগুলি যেমন সুদৃশ্য, তদনুরূপ চমৎকার। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ঝিনুকের সেতার, হস্তীদন্তের সেতার, ময়ূরযুক্ত এসরাজ এবং উত্তমোত্তম তানপূরা, বেহালা প্রভৃতি সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। হস্তিদন্তের নবরত্ন, চৌকী এবং

বাক্স, চিরুণী প্রভৃতি পরম সুন্দর। উত্তমোত্তম পক্ষী এবং অস্ত্রশস্ত্রও অনেক আসিয়াছিল। উলু দিয়া ছাওয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকান ঘরগুলি অতি কৌতুকাবহ,—চালে কাক, কপোত ও বানর বসিয়া আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকানীরা তুলাদণ্ডে তৌল করিতেছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রেতাগণ সম্মুখে দাঁড়াইয়া দর করিতেছে, তাহা দেখিয়া আহ্লাদে হাস্য করিতে হয়। বিবিধ ফল, পুষ্প এবং উদ্ভিজ্জগুলিও নেত্রতৃপ্তিকর হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর স্বহস্তে প্রদর্শকদিগকে পারিতোষিক দান করিয়াছেন। কতকগুলি সৌখীন বস্তু মেলাস্থলেই বিক্রীত হইয়াছে।

"দেশহিতৈষী মহোদয়েরা জাতিসাধারণ উন্নতি বর্দ্ধনার্থ যে শুভ অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তদর্থে তাহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া আমরা এতৎসম্বন্ধে কতিপয় প্রস্তাব করিতে বাধ্য হইতেছি...শুক্রবার আমরা বলিয়া ...রণ গ্রীষ্ম-কালে মেলার অনুষ্ঠান না করিয়া মাঘ মাসে ...গ্রীষ্মকালের প্রখর রৌদ্রে ...যাতে কেবল দর্শকবর্গের অ...ষ্ট এবং সোডাওয়াটর, লিমোনেড, বরফ, ও ডাব বিক্রেতাগণের ত্রিগুণ ভিন্ন আর কিছু বিশেষ উপকার দৃষ্ট হয় না। গত মেলায় ৫।৬ জনের সর্দ্দীগর্ম্মী হইয়াছিল। অতএব মাঘ মাসে হইলে...সেই সুবিধা হয়। দ্বিতীয়তঃ কেবল দর্শনগৃহগুলি স্বতন্ত্র রাখিয়া একটি দীর্ঘ প্রশস্ত তাঁবুর মধ্যে সাধারণ কার্য্যালয় ...ষ্ট করা উচিত। সেই স্থানেই গীত প্রস্তাব পাঠ বক্তৃতা রাসায়নিক শিক্ষা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য্য করিলে ভাল হয়। একটী স্থানে থ...সকলে যদি সকল কার্য্য দেখিতে শুনিতে পান, তাহা হইলে স্থানে স্থানে ছুটাছুটি করিতে হয় না। বিশেষতঃ উপযুক্ত বিরামস্থল না থাকায় পুনঃ পুনঃ এখান ওখান করিতে অতিশয় ক্লেশ হয়। অধিক লোকের সমাবেশোপযুক্ত একটী তাঁবুতে গ্যালারি করাই পরামর্শ সিদ্ধ। তৃতীয়তঃ উদ্যান মধ্যস্থ মেলাস্থল পর্য্যন্ত শকটের গমনাগমন বন্ধ করা উচিত। অধিক জনতা মধ্যে গাড়ীঘোড়ার প্রবেশ অতিশয় শঙ্কার বিষয়। তাহাতে

হঠাৎ দুর্ঘটনা হইতে পারে। গত মেলায় এক ব্যক্তি একখানি শকটতলে পতিত হইয়া আহত হইয়াছে। রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, বাবু রমানাথ ঠাকুর ও বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি বহুদর্শী বিজ্ঞ মহোদয়েরা যে কার্য্যের অধ্যক্ষ, সে কার্য্য যে অবশ্যই ক্রমে ক্রমে বিশৃঙ্খলা বিহীন হইয়া বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইবে, তদ্বিষয়ে আমাদিগের সম্পূর্ণ ভরসা আছে।"

(খ) দিল্লীর দরবার, ১৮৭৭

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের জাতীয় মেলায় এই স্বরচিত কবিতাটি আবৃত্তি করেন। তাঁহার অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নাটকের প্রয়োজনে 'স্বপ্নময়ী নাটকে' (১৮৮২) 'ব্রিটিশ' স্থলে 'মোগল' শব্দ বসাইয়া ইহা* মুদ্রিত করেন। এখানে মূল কবিতাটি প্রদত্ত হইল :

দেখিছ না অয়ি ভারত-সাগর, অয়ি গো হিমাদ্রি দেখিছ চেয়ে,
প্রলয়-কালের নিবিড় আঁধার, ভারতের ভাল ফেলেছে ছেয়ে।
অনন্ত সমুদ্র তোমারই বুকে, সমুচ্চ হিমাদ্রি তোমারি সম্মুখে,
নিবিড় আঁধারে, এ ঘোর দুর্দ্দিনে, ভারত কাঁপিছে হরষ-রবে!
শুনিতেছি নাকি শত কোটি দাস, মুছি অশ্রুজল নিবারিয়া শ্বাস,
সোণার শৃঙ্খল পরিতে গলায় হরষে মাতিয়া উঠেছে সবে?
শুধাই তোমারে হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন?
তুমি শুনিয়াছ হে গিরি-অমর, অর্জ্জুনের ঘোর কোদণ্ডের স্বর,
তুমি দেখিয়াছ সুবর্ণ আসনে, যুধিষ্ঠির রাজা ভারত শাসনে,
তুমি শুনিয়াছ সরস্বতি-কূলে, আর্য্য কবি গায় মন প্রাণ খুলে,
তোমারে শুধাই হিমালয়-গিরি—ভারতে আজি কি সুখের দিন?

* শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত নাটক হইতে এই কবিতাটি উদ্ধার করিয়া "রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়ে" (১ম সংস্করণ পৃঃ ৬৬-৭) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

তুমি শুনিতেছ ওগো হিমালয, ভারত গাইছে ব্রিটিশের জয়,
বিষণ্ণ নয়নে দেখিতেছ তুমি—কোথাকার এক শূন্য মরুভূমি—
সেথা হতে আসি ভারত-আসন লয়েছে কাড়িয়া, করিছে শাসন,
তোমারে সুধাই হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন ?
তবে এই সব দাসের দাসেরা, কিসের হরষে গাইছে গান ?
পৃথিবী কাঁপায়ে অযুত উচ্ছ্বাসে কিসের তরে গো উঠায় তান ?
কিসের তরে গো ভারতের আজি, সহস্র হৃদয় উঠেছে বাজি ?
যত দিন বিষ করিয়াছে পান, কিছুতে জাগেনি এ মহা-শ্মশান,

বন্ধন শৃঙ্খলে করিতে সম্মান
ভারত জাগিয়া উঠেছে আজি ?
কুমারিকা হতে হিমালয়-গিরি
এক তারে কভু ছিল না গাঁথা,

আজিকে একটি চরণ আঘাতে, সমস্ত ভারত তুলেছে মাথা !
এসেছিল যবে মহম্মদ-ঘোরী, স্বর্গ রসাতল জয়নাদে ভরি

রোপিতে ভারতে বিজয় ধ্বজা,

তখনো একত্রে ভারত জাগেনি, তখনো একত্রে ভারত মেলেনি,

আজ জাগিয়াছে, আজ মিলিয়াছে—
বন্ধন-শৃঙ্খলে করিতে পূজা !
ব্রিটিশ রাজের মহিমা গাহিয়া
ভূপগণ ওই আসিছে ধাইয়া

রতনে রতনে মুকুট ছাইয়া ব্রিটিশ চরণে লোটাতে শির—
অই আসিতেছে জয়পুররাজ, ওই যোধপুর আসিতেছে আজ
ছাড়ি অভিমান তেয়াগিয়া লাজ, আসিছে ছুটিয়া অযুত বীর !

হারে হতভাগ্য ভারত-ভূমি,
কণ্ঠে এই ঘোর কলঙ্কের হার

পরিবারে আজি করি অলঙ্কার
গৌরবে মাতিয়া উঠেছে সবে ?
তাই কাঁপিতেছে তোর বক্ষ আজি
ব্রিটিশ রাজের বিজয় রবে ?
ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গাক্ আমরা গাব না
আমরা গাব না হরষ গান,
এস গো আমরা যে ক-জন আছি, আমরা ধরিব আরেক তান।

(গ) রাজনারায়ণ বসু রচিত অনুষ্ঠান-পত্র

এই অনুষ্ঠান পত্রখানিতে যে-সব বিষয় লিখিত ও আলোচিত হয় তাহাকেই ভিত্তি করিয়া জাতীয় মেলার প্রতিষ্ঠা :

A Society for the Promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal.

Now that European ideas have penetrated Bengal, the Bengalee mind has been moved from the sleep of ages. A restless fermentation is going on in Bengalee Society. A desire for change and progress is everywhere visible. People discontented with old customs and institutions are panting for reform. Already a band of young men have expressed a desire to sever themselves at once from Hindu Society and to renounce even the Hindu name. It is to be feared that the tide of revolution may sweep away whatever good we have inherited from our ancestors. To prevent this catastrophe and to give a national shape to reforms, it is proposed that a Society be established by the influential members of native society for the promotion of national feeling among the educated natives of Bengal. Without due

cultivation of national feeling, no nation can be eventually great. This is a fact testified to by all history.

The Nationality Promotion Society shall first of all use their best endeavours to revive the national gymnastic exercises. Half a century ago, there was a gymnasium in almost every village. This old practice should be again brought into life. The remark, lately made by our Excellency the Governor-General on seeing the boys of a Vernacular School at Ooterparah, to the effect, that the rising generation of Bengalees is not so strong and able-bodied as the previous one, is quite true. The cause of it is the too great importance attached now-a-days to bookish education in neglect of physical. The consequences are want of energy, a sickly habit of body, and premature old age and death. Many a young man after shining at college has broken down early and proved a regular incapable in after life. The Nationality Promotion Society shall publish tracts in Bengalee on the importance of physical education with special reference to its prevalence in ancient times, quoting passages from Sanskrit books in proof of such prevalence, and shall afford pecuniary aid to gymnasia established in the most important places in Bengal, where Hindu gymnastics will be taught. The Society will also publish tracts in Bengalee, giving, by instances quoted from the ancient history of the country, proofs of the military prowess of the ancient Bengalees, and mentioning isolated instances of the existence of such prowess in modern Bengalees also, such as the celebrated "fighting Moonsiff" who figured in the late Sepoy Rebellion on behalf on the English. The Nationality Promotion Society shall take into consideration in connection with this subject that of the best means of improving the present very weak and innutritious diet of the Bengalee,

which has in fact deteriorated from that of former generations.

The Nationality Promotion Society shall establish a Model School for instruction in Hindu music. Every nation has its music. It is to be regretted that the majority of the educated natives of India neither cultivate European nor native music. If they have any taste for music they have a little for the rude one of Jattras. The writer of this article recollects the cultivation of Hindu Music having been general in his infancy. Now little attention is paid to it by the general mass of educated natives. It will be the duty of the Society to establish a Hindu Musical School and cause such songs to be sung by its students as have a moral scope and have a tendency to infuse patriotism and martial enthusiasm into the heart.

The Nationality Promotion Society shall also establish a school of Hindu Medicine, where Hindu Materia Medica, and practice of physic will be taught freed from the error and absurdities that disfigure them. There are many excellent Hindu medicines which have been found to be very efficacious in some severe disorders. It is to be highly regretted that the knowledge of such medicines is being lost. It would have indicated want of foresight on the part of Providence, if India, so rich in every other thing, could not have produced medicinal herbs calculated to heal the diseases of its inhabitants. The hopes, that were formed of the graduates of the Medical College enriching English Pharmacopœa with Hindu Medicines, after due trial and experiment have proved vain. The Nationality Promotion Society shall endeavour to fulfil such expectations. The teacher of the proposed Hindu School of Medicine should be one who is acquainted with both English and Hindu medical sciences.

The Nationality Promotion Society will publish in the Bengalee the results of the researches of the Sanskrit scholars of Europe in the department of Indian Antiquities giving special prominence to their descriptions of prosperity and glory of ancient India, physical. intellectual, moral, social, political, literary and scientific. It will collect and publish both in English and Bengalee testimonies in favor of native charactor. It will publish in those languages tracts containing the panegyrics pronounced by European writers on the merits of the people of ancient and modern India. It will also publish in the Bengalee, biographies of the illustrious men of Ancient and Modern India, especially of Bengal, containing translations of the eulogiums pronounced upon them by European writers.

The Nationality Promotion Society shall afford every encouragement in their power to the cultivation of Sanskrit. It shall patronize the publication of important Sanskrit works, co-operating with the Asiatic Society of Bengal in this respect and shall offer pecuniary rewards or panegyrical addresses to the best Sanskrit scholars of Bengal.

The Nationality Promotion Society shall make it binding upon its members to ground the knowledge of their sons in their mother-tongue before giving them an English education. Education both in Bengalee and English, if carried on simultaneously, does great injury to the Bengalee education of a student, as he pays greater attention to the English than to the Bengalee language. Even for the sake of English education, we should ground our children's knewledge in their mother tongue, before setting them to learn English. If a boy, after studying the Bengalee for six or seven years, study English, he makes rapid progress in the last mentioned language, and gets clearer ideas of what he reads in

it than he would otherwise have done. Vernacular Scholar-ship-holders are found by experience to be the best boys in an English school. Any man who has the least patriotic feeling will not neglect to ground his sons in their mother-tongue first of all before giving them an English education.

The Nationality Promotion Society shall try its best to prevent the daily increasing corruption of the colloquial language of the educated natives who mix, in common conversation, English words with Bengalee in the most ridiculous manner imaginable. An idea which can be easily expressed in the Bengalee, they express by an English word. Southey says in his essay on style: "Ours is a noble language, a beautiful language. I can tolerate a Germanism for family sake; but he who uses a Latin or a French phrase where a pure old English word does as well, ought to be hung, drawn and quartered for high treason against his mother-tongue." If our educated natives had a tittle of such patriotic love for their mother-tongue, they would not commit such gross violations of propriety and taste in their common conversation as they are at present observed to do. The poverty of the Bengalee is no excuse as such poverty is not real but imaginary. The Bengalee language has of late been much enriched by the exertions of some of the educated natives whose names will be held in grateful remembrance by posterity. Even if the Bengalee were really a poor unfurnished language, it would be the duty of every patriot to improve it by constant use of it in a pure form in conversation. It must be admitted that it is impossible to avoid using Engiish words to express particular scientific ideas, particular posts and offices, certain public buildings, particular furniture, etc., etc., for which

there are no equivalents to the Bengalee language. We would be quite unintelligible if we use new coined Bengalee equivalents or such as have not come into common use in order to express the above ideas,* but it is quite unpardonable on the part of an educated native to express in English what he can easily do in the Bengalee. He should speak either pure Bengalee or pure English, but he should not jumble up both the languages. At present the colloquial language of the educated natives is a *lingua franca*, a most corrupt jargon, shocking, though we are unconscious of the same, to men of sense and good taste and reflecting great disgrace on us as a nation. An European gentleman would laugh to hear our conversation. Our written language is receiving daily improvements, but it is to be regretted that our colloquial language is so much neglected. No nation can make rapid strides in the path of progress unless they possess a highly developed language fit to answer all the requirements of conversation or writing. The Revd. Mr. Richards in his address to the University of Madras, says: "Gentlemen, let me say there is but little hope of a nation, until it has some sense of nationality; and nationality without a national language, which is the free spontaneous outcome of the national mind, is a delusion. Probably, the best index to the growth of a people is growth and development of its language. Moreover, there is an interchange of cause and effect; help a people to develop their language in accordance with its own laws and you

*Persian words that have been naturalized into the Bengalee language and for which common unpedantic pure Bengalee words cannot be substituted should of course be considered as Bengalee words.

help them to acquire freedom of thought, and so gradually the other habits which are necessary to the formation of national character. I appeal then to your patriotism. I appeal to you on behalf of your mother-tongue ; it is well worthy your regard."

The Nationality Promotion Society shall make it binding upon its members to correspond with each other in the Bengalee. The Members of no nation correspond with each other in a foreign language. No English man for instance would correspond with another in French or German. Why should educated natives then insult their mother-tongue by writing letters to each other in English ? Is our language so poor as to render it too difficult for one to write a common letter in it ? It is excusable, nay more, it is proper, on the part of youths studying English, or even those who have recently left College to correspond with each other in English for the sake of acquiring proficiency in English writing ; but it is not at all proper on the part of elderly people to do so. Business letters that require to be written in English should of course be written in that language.

The Nationality Promotion Society shall endeavour to prevail upon their countrymen to hold in the Bengalee language the proceedings of such societies as do not require the co-operation of Englishmen, and are exclusively composed of Bengalees, or have not as their object the improvement of youth in English speaking or writing. If it be necessary to publish such proceedings for the information of Government and the European public, they can be translated into English for the purpose. Although the time is not yet ripe for the change, the Nationality Promotion So ciety shall from this time eadeavour to impress upon the

minds of their countrymen, the impropriety on the part of an educated native of delivering at public meetings, speeches addressed to his countrymen in English or of writing pamphlets so addressed in that language. An Englishman, for instance, would not address his countrymen in French and German. * It must be submitted that reformers and public agitators are obliged to address their educated countrymen in English, or else they do not obtain a hearing from the majority of them, such is their fondness for everything English and aversion towards everything Bengalee ; but it is expected that the good sense of our educated countrymen would gradually allow this practice to fall into disuse. The writer of this article regrets the prevalence of Anglo-Mania in his time which has obliged him to initiate a movement in favour of his mother-tongue by addressing his educated countrymen in English.

No reform is accepted by nation unless it comes in a national shape. The Nationality Promotion Society will not initiate or take an active part in social reformation—as such reformation is not its principal end or aim—but will aid it by rousing national feelings in its favour. Men naturally look to the past for sanction for their acts and nothing aids reformation so much as a former national precedent. The Nationality Promotion Society shall therefore publish tracts in the Bengalee containing proofs of the existence of liberal and enlightened customs in Ancient India, such as female education, personal liberty of females,

* Periodicals for the discussion of political subject and pamphlets intended for the persual of both Europeans and natives, or of the natives of the different presidencies should of course be written in English.

marriage by election of the bride, marriage at adult age, widow-marriage, inter-marriage, and voyage to distant countries. It will try to introduce such foreign customs into educated society as have a tendency to infuse national feeling into the minds of its members such as that of holding festivities in honor of men of genius as is done amongst European nations. The Nationality Promotion Society will not resist the introduction of good foreign customs into educated native society, as that would be a bar to all improvement; but will try to give if possible to foreign customs already introduced a national shape. It has for instance become almost a custom among the educated natives to congratulate each other on the occasion of the New Year's day. The Nationality Promotion Society will endeavour to induce them to offer such congratulation to each other on the occasion of our New Year's day, the 1st of Bysakh. It will use its best endeavours to prevent the introduction of pernicious foreign customs such as that of drunkenness. It will attempt to prevent the falling into abeyance of the good old customs of our country. There is for instance a custom prevalent in our country of sisters making affectionate presents to brothers on a certain day of the year. It would be a great loss if the tide of revolution sweep away such beautiful customs as the one above-mentioned. No one can object to the Bhratriditya if freed from the superstitious observances that accompany it. The Nationality Promotion Society shall, in a few words, try, firstly, to prevent the introduction of evil foreign customs into educated native community; secondly, to introduce such foreign customs as have a tendency to infuse national feeling into the minds of its members; thirdly, to give, if possible, to foreign customs already introduced a national shape, fourthly, to aid social reformation by citing old precedents in its favour; and fifthly, to prevent the abolition of such old customs of the country as are beneficial in their nature.*

* There would be no hindrance on the part of a Member of the Nationality Promotion Society, to be a Member of a Social Reformation Society, the rules of which do not require him to surrender his nationality.

The Nationality Promotion Society will not overlook even such trifling points as the regulation of etiquette, with a view to give a national shape to the same. It would be impossible to abolish all foreign modes of etiquette that have crept into educated native society, nor is it desirable to do so. Such cordial usages as the hearty hand-shake, some . thing similar to which has, by the bye, prevailed among our countrymen of the North-West, from a remote antiquity, as is evidenced by the Sanskrit plays, but the members of the Nationality Promotion Society shall give the preference to our national *namuskar* and *pranam* on all occasions on which it is practicable to do so.

With regard to dress, the Nationality Promotion Society need not direct its attention to that subject, as the educated natives have already adopted a mode which is not strictly European. This has been as required by the demands of nationality. If we at all imitate other nations. we should not do so slavishly. We should chalk out a path of our own. We should follow the same principle in the improvement of the dress of our women.

With regard to diet, the educated natives belonging to the higher classes of Society have adopted a mode of living that cannot be called *exclusively* European. It cannot be otheswise. The European mode of living is quite unsuited to the people of this country. Those educated natives who adopted an exclusively European mode of living were obliged by ill health in the course of a few years to resume the native or to modify the former. Those who have adopted a partly European mode of living will find it beneficial to Indianize it still further. The Nationality Promotion Society will direct their attention to this point, as well as to the diet of the majority of the educated natives which is in fact deteriorated as has been observed before from that of our ancestors. Anent this subject, we may observe that it would be the duty of the Nationality Promotion Society to reprobate the practice of frequenting European hotels so common among our educated countrymen. This practice shows a greedy hankering after European food, and demeans us in the eyes of foreigners. It must appear ridiculous in the eyes of all Europeans, except hotel-keepers.

With regard to dramatic entertainments the Nationality Promotion Society need not direct its attention to the same, as the educated natives of Bengal are already adopting a national plan of such amusements. They do not, like the Parsees of Bombay, act English plays, but do so Bengalee dramatic compositions on the English plan. This is as it should be. For carving out our nationality, we should adopt the principle of adaptation in other things as we have done in this.

An attempt to shew that the religion of our ancestors contains much that is worthy of respect as well as union to represent political grievances to Government are calculated to promote national feeling ; but the Nationality Promotion Society will not take measures for the same as there are separate associations, namely, the Brahmo Somaj and the British Indian Association, established solely for the purposes above-mentioned. It will abstain from the agitation of religious and political subjects.

The above Scheme of a Society for the promotion of National feelings among the educated natives of Bengal is of course subject to modifications by the public.

It would be unreasonable to expect that such a Society would prove to be the cause of every national feeling. Its main object would be to promote and foster national feelings which would lead to the formation of a national character and thereby to the eventual promotion of the prosperity of the nation.

Such movements as the establishment of a Society like the one proposed should originate in the metropolis. People of the Mofussil as is the case in every country follow suit in everything with those of the metropolis.

It is intended to publish a translation of this article in Bengalee in the form of a pamphlet* and circulate it among the mass of our countrymen.

* উমেশচন্দ্র দত্ত বাংলা ভাষায় এই অনুষ্ঠান-পত্রখানির অনুবাদ করেন। ('বিবিধ প্রবন্ধ'। ১৮৮২। পৃ. ৭৩-৮৩ দ্রষ্টব্য।)